রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী আফগান
গেরিলাদের বিস্ময়কর উপাখ্যান
জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান
তারেক ইসমাইল
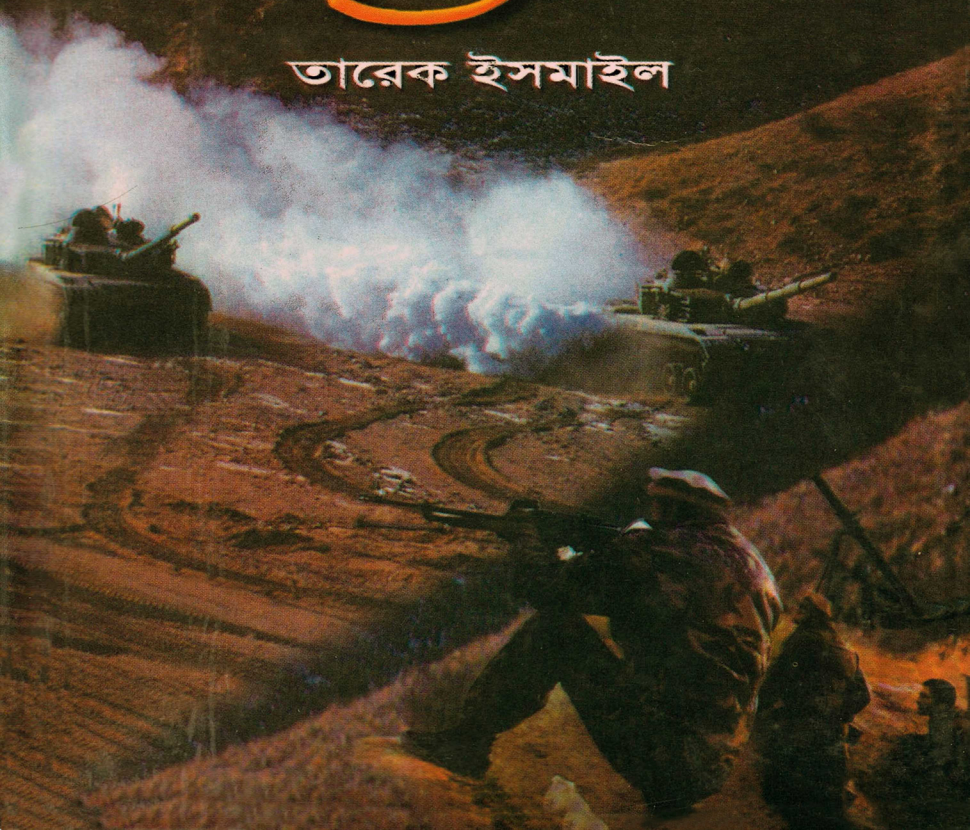
জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল
ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

আল-খালেদ প্রকাশন

কিছু কথা

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান–শেষ খণ্ড বের করতে পেরে আল্লাহ পাকের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রথম খণ্ড পড়ার পর পরবর্তী কাহিনী পড়ার জন্য পাঠক ভাইগণ হয়ত অনেক উদগ্রীব ছিলেন। পরবর্তী খণ্ড বের হতে কিছুটা বিলম্ব হওয়াতে আপনাদের অনেকের মনে হয়ত কিছুটা তিরস্কারভাবও এসেছে, এটা স্বাভাবিক। বিলম্বিত হওয়ার জন্য দুঃখিত। আশা করি, সব আক্ষেপ ভুলে গিয়ে মনোযোগ সহকারে বক্ষমান বইটি পড়বেন।

বইটি প্রকাশকালে একটি ঘটনা মনে পড়ল।

পাকিস্তানের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউল হক (রহঃ) একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সে বইটিও ছিল আফগান জেহাদ সম্পর্কে। তিনি তাঁর ভাষণে বলছিলেন ঃ

"আফগান জেহাদ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর এক অলৌকিক ও অভূতপূর্ণ ঘটনা। কীভাবে মুষ্টিমেয় মুজাহিদীন আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিশাল সোভিয়েত শক্তিকে লজ্জাজনক পরাজয়দানে সামর্থ হলেন। এ জেহাদেরই বরকতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অভ্যূদয় ঘটল অনেকগুলো মুসলিম দেশের। মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রের তৌহিদী জনতা রুশ ভল্লুকের থাবা থেকে নিস্কৃতি পেল। এটা আফগান মুজাহিদদের কোরবানীর ফলেই সম্ভব হয়েছে। এর পুরো কৃতীত্ব তাদেরই। আমরা পুরো মুসলিম জাতি তাদের এ

কৃতীত্বে গর্বিত। অনেক লেখক, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক, উপন্যাসিক তাদের গর্বভরা ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতে থাকবে। কিন্তু তাদের বিজয় ও ঈমানদীপ্ত দাস্তানের তাৎপর্য শেষ হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রচেষ্টা, কোরবানী ও আত্মত্যাগকে কবুল করুন। আমার সবচেয়ে বড় কামনা হল, আমার আফগান ভাইয়েরা যেন শান্তি, সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতে পারে এবং তারা তাদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে বিশ্বে মাথা তুলে চলতে পারে, এটা আমি স্বচক্ষে দেখে যেতে চাই। আল্লাহ আমার এ আশাকে পূর্ণ করুন, আমীন।”

আমিও জেনারেল জিয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, আফগান ভাইয়েরা বর্তমানে যে সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, এটা চিরস্থায়ী হবে না। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেই লেজগুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। আফগান ইসলামী মিল্লাত তাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সামর্থ হবে। তারা ভিন্নদেশী বিধর্মী সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত ভেঙ্গে দিয়ে আফগান ভূমিতেই তাদের কবর রচনা করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

বনানী, গুলশান-ঢাকা

শেখ নাঈম রেজওয়ান
১৩/১০/২০০৩ ঈসায়ী

সূচীপত্র

অগ্নি শিখা ও শিশির → ৭
জেহাদের পথে → ২১
গন্তব্যস্থলের মুসাফির → ৩১
গায়েবী সাহায্য → ৩৫
ফাঁদ → ৪৯
থাবা → ৭০
জি, আর, ইউ → ৭৫
নতুন শিকারী → ৭৯
মরণ পথ → ৯১
আহমাদ তুরসুন → ১১১
পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্র → ১১৫
সেই উপকারী পথপ্রদর্শক → ১২৫
স্পাটনাজ কমান্ডো বাহিনী → ১৪৫
'আমি বিদায় নিচ্ছি বাবা, জেহাদ কখনো ছেড়ো না' → ১৫৫
শেষ পরিণতি → ১৬৩
নতুন পথের যাত্রী → ১৭৩

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান ২

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল

ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

অগ্নি শিখা ও শিশির

পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তাদেরকে কাবুল ছাউনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রচণ্ড শীতে ছাউনীটিকে মৃত্যুপুরীর মত মনে হত। দিনের বেলায় কর্ম ব্যস্ততা স্বাভাবিক গতিতেই চলতো। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়তেই সেদিক থেকে একটা রহস্যময়ী শীতল হাওয়া পূর্ব দিকে বইতে শুরু করতো। রাতের আঁধার যত গাঢ় হতো শীতের তীব্রতা যেন ততই বেড়ে চলতো।

অবশেষে সেই কাঙ্খিত দিনটি এসে গেল। ফয়জানকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে পাঠানো হচ্ছে। আজ সে কাবুল থেকে লোগার যাচ্ছে। তাদের সামরিক কনভয়টি পাহাড়ের মধ্যদিয়ে বানানো সড়ক অতিক্রম করছে।

রাস্তা নিরাপদ রাখার জন্য সড়ক ঘেসা পাহাড়গুলোতে পূর্ব থেকেই নিরাপত্তা রক্ষীরা মোর্চা বানিয়ে পজিশন নিয়ে ছিল, যেন মুজাহিদ বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে কনভয়ের ক্ষতি সাধন না করতে পারে। কনভয় রক্ষার জন্য দুটি হেলিকপ্টার তাদের আগে আগে মাথার উপর উড়ছিল।

এই বাহিনীর কমান্ড ফয়জান উগলুর হাতে। সে আর্মি জীপের সামনের আসনে বসে আছে। জীপটি চালাচ্ছে মধ্যবয়সের একজন স্পাট চেহারাওয়ালা আফগান সোলজার। তার সতর্ক দৃষ্টি সড়কের সম্মুখ পানে নিবদ্ধ।

কখনো এই পথ দিয়ে ইসলামের নিবেদিত প্রাণ বীর মুজাহিদরা ইসলামের মহান বার্তাকে পথহারা কাফেলার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য অশ্ব ছুটিয়ে দিতো, যাদের কপালে সিজদা ও বিশ্বস্তার চিহ্ন থাকত উদ্ভাসিত; কিন্তু আজ এই জনপদকে লাল সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা গ্রাস করে নিচ্ছিল। কনভয় যত অগ্রসর হচ্ছে, সড়কের দু'ধারের পর্বত শ্রেণীর বিশালত্ব যেন বেড়েই চলছে। পর্বতের কোলে দন্ডায়মান আলুচা, খোবানী এবং চানারের বৃক্ষগুলো থোকা থোকা ফলের চাপে নুয়ে পড়ার উপক্রম। এসব ফলের সুবাস পরিবেশকে বিমোহিত করে রেখেছে। কিন্তু ফয়জানের নাকে কেমন জানি ফলের সুমিষ্ট ঘ্রাণের সাথে সাথে তপ্ত তাজা রক্তের ঘ্রাণও ভেসে আসছে। এ রক্ত যেন এই পবিত্রভূমির তৌহিদী জনতার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। যাদেরকে রুশ হানাদার ও তার সেবাদাস নাস্তিক সৈনিকরা মুসলমান ও ঈমানদার হওয়ার অপরাধে গুলী করে ও সঙ্গীনের আঘাতে শহীদ করে দিয়েছে। তার মনে হল যেন আলুচা, খোবানী ও চানারের বৃক্ষের মূল থেকে টাটকা শোনিত ধারাও বয়ে যাচ্ছে। সবুজ বৃক্ষগুলো তার কাছে রক্তিম মনে হচ্ছিল, যেগুলো সেই মহান শহীদানের রক্তের পরশে বেড়ে উঠছে, যারা নাস্তিক রুশ সাম্রাজ্যবাদের হীন পরিকল্পনাকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের পবিত্র জীবনকে কোরবান করে দিয়েছে।

পাহাড়ী রাস্তাটি এখন বৃত্তাকার হয়ে উঁচু হতে লাগল। জীপের জানালা দিয়ে ফয়জান নীচের দিকে তাকালো। পাহাড়ের কোল বেয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে যেই জলধারাটি নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হচ্ছে, সূর্যের সোনালী কিরণ তার উপরে পড়ে ঝিকমিক করছিল। কিন্তু খানিকের মধ্যেই একটি বাদল এসে সূর্যের সেই উত্তাপকে নিস্ক্রীয় করে ফেলল। হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হতে লাগল। সেই সাথে তুষার ঢেকে ফেলতে লাগল পরিবেশকে। নিমিষের মধ্যে প্রচন্ড শীতের লহর বয়ে গেল; কিন্তু ফয়জানের ভিতরের জযবাকে এই প্রচন্ড শীত ঠান্ডা করতে পারলো না বরং বে-দ্বীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ যেন ক্রমে-ক্রমে বেড়েই চলছিল।

।। ২ ।।

আগে আগে যে হেলিকপ্টার দুটি উড়ে চলছে, হঠাৎ করে তাদের ইংগিত পেয়ে পুরো কনভয়টি থেমে গেল। মনে হয় পাইলটরা সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছে। এখন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কনভয় সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

ফয়জান জীপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সে সামনে পাহাড়ের কোলে একটি চূড়ায় মাটি দিয়ে তৈরী কয়েকটি বাড়ী দেখতে পেল। ঐ সব বাড়ী থেকে রশির মত প্যাঁচানো একটি সরুপথ তাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। জীপ থেকে সামান্য দূরে একটি পাহাড়ী প্রস্রবন বয়ে যাচ্ছে।

ফয়জান বুঝে ফেলল যে, কেন কনভয়টি থেমে গেছে! সেই আঁকা বাঁকা পথ ধরে ছোট ছেলে-মেয়ে এবং মহিলারা পানি নেওয়ার জন্যই এদিকে আসছিল। তার দৃষ্টি সরুপথটির উপর স্থির হয়ে রইল। সে দেখল যে, পাঁচটি ছেলে-মেয়ে এবং দু-তিন জন পর্দানশীন মহিলা সে দিকে আসছে। ফয়জান অপলক দৃষ্টিতে লাল-সাদা মিশ্রনে গড়া সেই সব কিশোর-কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে রইল, যাদের চেহারাগুলো ছিল উজ্জ্বল; কিন্তু খানিক ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবও তাদের চেহারাগুলোতে ফুটে উঠছিল। কিশোররা তাদের কাছ দিয়ে চলে গেল। ভীত-বিহবল শিশুদের দেখে ফয়জানের কলিজাটা ফেটে যাচ্ছিল। পর্বতের চূড়া যেন ওদের অবস্থা দেখে শোকে মূহ্যমান, প্রতিটি পাথরকণা ভারাক্রান্ত, শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ ক্রন্দনরত।

শিশুরা চুপ চাপ নিজেদের পানির পাত্রগুলো ভরে নিল এবং দৃঢ়ভাবে পা ফেলতে ফেলতে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়েই চলে গেল। ইংগিত পেয়ে কনভয়টিও চলতে লাগল।

সূর্য যে মেঘমালার আবরনে মুখ লুকিয়ে রেখেছিল, সেও যেন এই পাহাড়ের সন্তানদের স্বাধীন চেতনাকে ছালাম করার জন্য মেঘের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এলো। কনভয়টি আঁকা বাঁকা কংকরময় সড়কের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। সূর্য অনাবৃত

হয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলছে। খোবানী, আলুচা ও চানার বৃক্ষের পাতায় জমা শিশিরগুলো চোখের অশ্রুর মত টপ-টপ করে ভূমিতে পড়ছে।

পর্বতের উচ্চভূমি থেকে তারা এখন নিম্নভূমির দিকে চলছে। সড়কটি বিপদজনক ও আঁকা-বাঁকা। কনভয়টিও খুবই ধীরগতিতে কচ্ছপের মত পথ অতিক্রম করে লোগারের পানে অগ্রসর হচ্ছে।

ফয়জান ভাবছিল ঃ

এই পথ দিয়েই কোন এক সময় দিগ্বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান মাহমুদ গজনবী (রঃ) ও সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর বীর সেনানীরা অশ্ব ছুটিয়ে খায়বার গিরী অতিক্রম করত। পাহাড়ের এই চূড়াগুলো কখনো ইসলামের দুঃসাহসী সৈনিকদের তেজদৃপ্ত চেহারা দেখেছে, যাতে ঈমান ও দৃঢ় সংকল্প দীপ্তিমান থাকত। কিন্তু আজ ফয়জান এই পথ দিয়ে অতিক্রম করতে লজ্জাবোধ করছে। সেই মহান কাফেলার উত্তরসূরীদের দুরবস্থা দেখে সে দারুনভাবে মর্মাহিত। রুশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামী তাঁদের গলায় ফেঁসে গেছে।

পার্বত্য সড়কটি এখন অনেক নীচে এসে গেছে। সূর্যের প্রখরতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ফয়জান কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উঁচু-উঁচু পাহাড়ের উপর বিশাল উন্মুক্ত নীল আকাশ এবং সোনালী রোদ শীতে কম্পমান শরীরের জন্য সত্যিই যেন মায়ের কোলের কাজ করছিল।

স্বচ্ছ পানির যে ধারাটি উঁচু থেকে নীচে প্রবাহিত হচ্ছে, ফয়জানের দৃষ্টি থেকে সেটা উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেটা আবার একদম তাদের সামনে এসে গেল। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফেনায়িত হয়ে দ্রুতগতিতে কলধ্বনি করে প্রবাহিত হচ্ছে।

পাহাড়ের রসালো ফলের সারি সারি বৃক্ষ ধারাগুলো এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাফেলা ধীরে ধীরে জনবসতির দিকে এগিয়ে চলছে। পাহাড়ের আকৃতির মধ্যেও পরিবর্তনের ছাপ ফুটে ওঠছে। কনভয় যতই লোকারণ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ফয়জান দেখতে পাচ্ছে রুশ

জঙ্গী বিমানের ধ্বংস তান্ডব। বোমা বর্ষনের ফলে ঘর-বাড়ী জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়ে আছে গভীর খাদ। তার মনে হল যেন পামির থেকে শুরু করে কোহে সফেদ পর্যন্ত পর্বতমালার সবুজ বনানীতে হঠাৎ করে আগুন ধরে গেছে। পাহাড় জ্বলছে। আফগানিস্তান জ্বলছে।

পাহাড়গুলোর এই আগুন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ফয়জানের অন্তরে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করছে। এই টগবগে আবেগকে সঙ্গে নিয়ে সফর করতে করতে পরিশেষে সে লোগার সেনাছাউনীতে প্রবেশ করল।

লোগার ছাউনীতে দু'মাস পর্যন্ত তারা অবস্থান করল। তারপর বিমান ও হেলিকপ্টার যোগে তাদেরকে খোস্ত গ্যারিসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। খোস্ত হচ্ছে পাকতিয়া প্রদেশের বৃহত্তম শহর। এখানেই রয়েছে কম্যুনিষ্ট সরকারের বিশাল সেনাছাউনী। মুজাহিদরা গত দু বছর ধরে এ ছাউনীকে অবরোধ করে রেখেছে।

।। ৩ ।।

খোস্ত প্যারিসনে নিস্প্রভ ও কঠোর চেহারার একজন রাশিয়ান কর্ণেল তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। রাত এলে তাদেরকে অফিসার্স মেসে রুটিন অনুযায়ী এমন কিছু ফিল্ম দেখানো হল, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করা। এ সব ফিল্মে মুজাহিদদের হিংস্র ও নিষ্ঠুর রূপে দেখানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এসব হিংস্র প্রকৃতির সন্ত্রাসবাদীরা বহিঃশক্তির ইশারায় "মহান কমিউনিজম বিপ্লব" ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে অপচেষ্টায় লিপ্ত।

পরদিন সাধারণ অধিবেশনে একজন আফগান কর্ণেল সেনাদের লক্ষ্য করে লেকচার দেয়। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার পর সে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহকে গালি দিয়ে বলল যে, "এসব দেশ আফগানিস্তানের উন্নতি ও প্রগতি দেখতে চায় না। এসব অপশক্তি চায় না আফগান জনগণ সুখ সমৃদ্ধি

অর্জন করুক। মুজাহিদরা এদের ইংগিতে আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"

ঐ অধিবেশনে এ কথাটিও বলা হল যে, এখান থেকে দশ-পনের মাইল দূরে মুজাহিদদের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত কেন্দ্র "ঝাওয়ার" অবস্থিত। এই কেন্দ্রের সাথে পাকতিয়া প্রদেশ থেকে শুরু করে রাজধানী কাবুল পর্যন্ত মুজাহিদদের যোগাযোগ রয়েছে। গজনী, পাগমান সহ নিকটবর্তী যতগুলো প্রদেশে মুজাহিদীনের জেহাদী তৎপরতা রয়েছে, এসবগুলোর জন্য "ঝাওয়ার" হচ্ছে প্রধান সাপ্লাই লাইন। আমরা মুজাহিদদের এই কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি।"

"ঝাওয়ার মারকাজ"কে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। আফগান কমান্ডো ছত্রী সেনাদেরকে মুজাহিদীনের বাংকারের আশে পাশে অবতরণ করানো হবে। তারপূর্বে আফগান জঙ্গী বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনী মারাত্মকভাবে বোমা ও গোলা বর্ষন করবে, যাতে মুজাহিদদের বাংকারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

বিমান ও হেলিকপ্টার দিয়ে কমান্ডোদের অবতরণ করানোর সঙ্গে-সঙ্গে পদাতিক বাহিনীকে ঝাওয়ারের দিকে এডভান্স করানো হবে।

ঝাওয়ার দখল করে মুজাহিদ পজিশনগুলোকে ধ্বংস করা হবে। তারপর ভবিষ্যতে যাতে মুজাহিদীন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে না পারে সেজন্য সেখানে আফগান সৈনিকরা শক্তিশালী বাংকার বানাবে।

।। ৪ ।।

সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এখনো সাধারণ সৈনিকদেরকে ঝাওয়ার আক্রমনের ব্যাপারে চূড়ান্ত তারিখ অবহিত করা হয়নি। কারণ, রুশ ও আফগান কর্মকর্তারা জানত যে, তাদের মধ্যে মুজাহিদদের অনেক চর রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, কোন আফগান সৈনিক যার মধ্যে ইসলাম ও জাতির প্রতি ভালবাসা

রয়েছে, নিজের জান হাতে নিয়ে চুপিসারে এখান থেকে বের হয়ে মুজাহিদদের কাছে হামলার তথ্য পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। তবে ফয়জান উগলু বুঝতে পেরেছিল যে, আগামী হপ্তার কোন এক সময়ে এই আক্রমণ হতে পারে। তার মনে হচ্ছিল, হায় তার যদি দু'টি ডানা থাকতো তাহলে উড়ে গিয়ে ঝাওয়ার মারকাজে মুজাহিদদের কাছে হামলার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারত।

পরবর্তী রাতে যখন সে মেস থেকে নিজের কামরার দিকে যাচ্ছে তখন সে আচমকা একটি দ্রুতগামী জীপ তারই দিকে আসতে দেখল। জীপের হেডলাইট জ্বালানো। ড্রাইভার খুব দ্রুত গতিতে গাড়ী চালিয়ে তারই দিকে আসছে।

ফয়জানের একেবারে কাছে এসে গাড়ীটি হার্ড ব্রেক করল এবং জীপটি চর চর শব্দ করে থেমে গেল।

সামনের আসনে বসা ছিল একজন রাশিয়ান মেজর। জীপ ড্রাইভারও ছিল রাশিয়ান। পিছনের আসনে একজন সৈনিককে দেখা গেল, যার চোখ ও হাত দুটো পিছন দিক দিয়ে বাঁধা এবং অন্য দুজন সৈনিক তাকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে।

জুনিয়র অফিসার ফয়জান উগলু থ খেয়ে গেল, আরে এতো তারই ইউনিটের সৈনিক!

রাশিয়ান মেজর জীপ থেকে নেমে এলো। তার ইউনিফর্মে দৃষ্টি পড়তেই ফয়জান তাকে স্যালুট করে অভিবাদন জানাল।

"তুমি তোমার কোম্পানীর সৈনিকদেরকে লাইনে হাজির কর।" রুশ মেজর ফয়জানকে নির্দেশ দিল।

জুনিয়র অফিসার ফয়জান পুনরায় স্যালুট দিয়ে তার ব্যারাকে চলে এল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার কোম্পানীর জোয়ানদেরকে লাইনে হাজির করা হল। গণনা করে দেখা গেল যে, পাঁচজন সৈনিক কম।

"এরা কোথায় গেছে?" রাশান মেজর কড়া ভাষায় ফয়জান উগলুকে জিজ্ঞেস করল।

“তারা কোথায় গেছে এটা খোঁজ করা আমার ডিউটি নয় জনাব!” ফয়জানের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল।

“শাট আপ।” রাশিয়ান মেজর গর্জন করে ওঠল। “এরা তো সবাই পালিয়ে গেছে।” সে গলা ফাটিয়ে ফয়জানকে লক্ষ্য করে বলল।

“এই নরাধমও ওদের সঙ্গী ছিল। ও পালাতে পারেনি।” মেজর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে বলল, যাকে এখন তার নির্দেশে জীপ থেকে বের করে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। জীপ এখানে যখন পৌঁছল, তখনই রাশিয়ান সৈন্যদের একটি সেকশন নিজেদের ব্যারাক থেকে বের হয়ে এখানে পৌঁছে ফয়জান উগলুর ইউনিটের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাইনে হাজির হয়েছিল। রুশ মেজর তাদের দিকে তাকাল।

তার ইংগিত বুঝে দুজন রুশ সৈনিক লাইন থেকে বেরিয়ে মেজরের কাছে এল।

“ওর চোখ থেকে বাঁধন হটাও।” মেজর নির্দেশ দিল। গ্রেফতারকৃত আফগান সৈনিকের চোখ থেকে বাঁধন সরানো হল। ভয়ে বন্দীর চেহারা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

“ওরা কোন্ পথ দিয়ে পালিয়েছে?” রাশিয়ান মেজর খাটি ফার্সী ভাষায় কয়েদীকে জিজ্ঞেস করল।

“কারা?”কয়েদীটি দ্ব্যর্থহীনভাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল মেজরকে লক্ষ্য করে। ফয়জান অনুভব করল যেন আকস্মিকভাবে বন্দী সৈনিকটির চোখে জীবন ফিরে এসেছে।

“কারা! ওকে বুঝিয়ে দাও।” মেজর দাঁড়ানো রুশ সৈনিকদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল।

মেজরের বলতে দেরীও হয়নি, উভয় সৈন্য সামরিক বুট দিয়ে একই সঙ্গে শক্তিশালী লাথী বসিয়ে দিল কয়েদীটির পাঁজরে। আফগান সৈনিকটি মারাত্মক ব্যথায় কুঁকিয়ে ওঠল; কিন্তু তবুও সে মুখ খুলল না। রাশিয়ান সৈনিক দুটি হিংস্র প্রাণীর মত অবিরাম গতিতে তাকে পিটাতে লাগল। এখন মেজরও তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

দশ মিনিট পর আফগান সৈনিকটি অর্ধ বেহুশ হয়ে ধরাম করে পড়ে গেল; কিন্তু তবুও সে তার সাথীদের পালানোর রাস্তা সম্পর্কে কিছুই বলল না।

অর্ধ অচেতন, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আফগানীর উপর নুয়ে রুশ মেজর তার মাথার চুলগুলো নিজের মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে সেই চুলগুলো প্রচন্ডভাবে টান মেরে মেরে কয়েকবার সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল। অবশেষে মজলুম আফগান সৈনিকটি খুব জোরে মেজরের মুখের উপর থু থু নিক্ষেপ করল।

রুশ মেজর টান করে দাঁড়িয়ে গেল!

তার চোখ দুটো প্রচন্ড ক্রোধে লাল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার ডানে দাঁড়ানো রাশিয়ান সেনার কাছ থেকে সে ক্লাশিনকোভ নিয়ে নিল এবং পরক্ষণেই গালি বকতে বকতে মাতালের মত সেই আফগানীর উপর গুলি চালিয়ে দিল। মেগাজিন ভর্তি পুরো ত্রিশটি গুলী সেই আফগানীর উপর খরচ করে ফেলল!

কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে করতে সে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল।

আফগান সৈনিকদের ইউনিটে মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। তাদের ভিতরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে; কিন্তু তারা ভাল করেই জানে যে, কোন অসর্তক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাদেরকেও এই সৈনিকটির পরিণতি বরণ করে নিতে হবে। এজন্য ভেবে চিন্তে কাজ করাটাই সমীচীন।

"এবাউট টার্ন"! মেজরের নির্দেশ পেয়ে পুরো কোম্পানী পিছন ঘুরে সারিবদ্ধভাবে ব্যারাকে চলে গেল।

রাশিয়ান সেকশন এখন পর্যন্ত ওখানে বিদ্যমান ছিল। আফগানরা চলে গেলে রাশিয়ান সৈনিকরা মৃত সৈনিকটির পা ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। লাশের সাথে অসদাচরণ করতে করতে তারা সেটাকে কেল্লার দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলো। তারপর বাইরের ডাষ্টবিনে আবর্জনার মধ্যে লাশ ফেলে রেখে তারা চলে গেল।

এখানে এ সব নির্মম কান্ড ছিল সাধারণ ব্যাপার। কোন ফেরারী সৈনিক ধরা পড়লে তার এমন পরিণতিই ভোগ করতে হত। পলাতক সৈনিকদের জন্য নিম্নতম শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড।

।। ৫ ।।

মেসের দিকে ফিরার পথে ফয়জান খুবই কষ্টে নিজের মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তার ইচ্ছে করছে, কেল্লার চূড়ায় যে সব মেশিনগান তাক করে রাখা হয়েছে সেগুলোর মুখ রাশিয়ান সৈনিকদের ব্যারাকের দিকে ঘুরিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু এখন তাকে মঙ্গলার্থে নীরবতা পালন করতে হবে। সে চাচ্ছে না যে, এই হতভাগ্য আফগান সৈনিকের মত সেও এভাবে অসহায় মৃত্যুবরণ করুক।

বৃদ্ধ চিত্রকর তার জীবনের জন্য যে পথ বাতলে দিয়েছিলেন, একমাত্র সেই পন্থা অবলম্বন করলেই সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে।

সে ভারী পদক্ষেপে হেঁটে তার কক্ষে এসে অসাড় হয়ে খাটের উপর বসে পড়ল। সে নিজের উর্দিটা খুলল না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। খাটের সাথের দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করল। সে আপ্রাণ চেষ্টা করল মৃত্যুপথযাত্রী আফগান সৈনিকের রক্তাক্ত চেহারা আর রাশান মেজরের রক্ত পিপাসু চোখ দুটো ভুলে যেতে; কিন্তু পারছে না। সে নিজের ভাবনার স্রোতকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার হাজারো চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু প্রতিবারই সেই শহীদ আফগান সৈনিকের ছটফট করা লাশ তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

শহীদের সেই রক্তভেজা চেহারাটি ফয়জানের কাছে বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ফরজানের কাছে তার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর ছিল না। অবশেষে সে তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়ল।

।। ৬ ।।

হঠাৎ তার কেমন যেন মনে হল, কামরার দরজায় কেউ যেন মৃদু আঘাত করছে। সে ওঠে দরজা খুলে দিতে চাইল; কিন্তু তার শরীর যেন চলতে চাইছে না। ফয়জানের মনে হল যেন তার শরীরে চঞ্চলতা নেই; নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে দরজা নিজে নিজে আস্তে খুলে গেল।

ফয়জান হতবাক, সে ভাবল আমি তো দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, সেটা কি করে খুলে গেল? ভিতরে যে লোকটি এলো তার অবয়ব অন্ধকারের কারণে স্পষ্ট হচ্ছিল না; কিন্তু ফয়জান আন্দাজ করতে পারল, আগন্তুক কোন পুরুষ নয়, রমনী।

আগন্তুক দরজা বন্ধ করে যেই ফয়জানের দিকে তাকাল, ফয়জানের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত। আরে, এতো ভিলেনতিনা!

"ভিলেনতিনা, তুমি এখানে?" ফয়জানের মুখ থেকে খুব কষ্টে কথাগুলো বের হল। আনন্দ ও বিস্ময়ের মিশ্র অনুভূতিতে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হল।

"হ্যাঁ ফয়জান আমিই....।" ভিলেনতিনা খুবই শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল। মনে হল, তার শব্দগুলো কোন গভীর কূপ থেকে বেরিয়ে আসছে।

"কিন্তু, তুমি তো মারা গেছ, এখানে কিভাবে এলে?" ফয়জান বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ ফয়জান! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি আসলে মারা গেছি, কিন্তু আমার আত্মা তোমার সঙ্গে ঘোরা ফেরা করছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে তোমার আসল গন্তব্যে পৌঁছতে না দেখব, ততক্ষণ আমার আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাবে না।"

ফয়জানের কিছু বলার পূর্বে ভিলেনতিনা তার কোমল হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"ফয়জান! আমি তোমাকে বলেছিলাম না, আমি তোমাদের

পল্লীতে তোমারই সঙ্গে থাকব, তোমার ভেড়া-বকরী চড়াব। তোমার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেব। বিশ্বাস কর ফয়জান! আমার কাছে তোমাদের চারণভূমি, তোমাদের পাহাড় আর পাহাড়ের কোলে জন্ম নেয়া মানুষগুলো খুবই ভাল লাগে। তাদের আকর্ষণ আমাকে সব সময় তাদের কাছে টেনে নেয়। আমার অন্য আর কোথাও মন টিকে না। ফয়জান! এস, কোথাও গিয়ে বসি।”

ফয়জান নিজের হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “চল।” চোখের পলকে তারা কাবুলের একটি মনোরম উদ্যানে চলে এলো। ফয়জান বিস্ময়ে হতবাক, লোগারে যাওয়ার সময় এখান দিয়েই তাদের সামরিক কনভয়টি গিয়েছিল। ভিলেনটিনার উপস্থিতি পরিবেশটিকে স্বর্গীয় করে তুলছে। ফয়জান তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে অনুভব করল যেন তৃষ্ণার একটি বিশাল মরুভূমি তার ঠোঁটের উপর বিছানো রয়েছে। এবার সেই তৃষ্ণা তার পুরো শরীরটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তার মনে চাইল, ভিলেনতিনা তার ঠোটের ওপর ভালোবাসার শিশির বর্ষন করুক, যে তার তৃষ্ণাকে অমৃত দান করবে। কিন্তু সে ভিলেনতিনার কাছে কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারল না।

দুজনে থোকায় থোকায় ভরা খোবানী ফল গাছের কাছে একটি পাথুরে জমির উপর বসে পড়ল। ফয়জানের মনে হল যেন তার আশে-পাশে ফল আর ফুলের ঘ্রানে ভরা পাহাড়গুলো লক্ষ্য করে কিছু বলছে। কে যেন তার কানে কানে কথা বলছে। কথাগুলো সে স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে।

“ফয়জান! যদি তুমি এমনভাবে উদাসীন হয়ে বসে থাক তাহলে সামনের মৌসুম তোমার অসহায়ত্বকে নিয়ে বিদ্রুপ করবে। শিশিরে ভেজা বাতাসগুলো তোমার অশ্রুকে নিয়ে উপহাস করবে। ভিলেনতিনার পবিত্র ভালবাসার সেই রক্তাক্ত স্মৃতি তোমার জীবন বিষাক্ত করে তুলবে। যদি দ্রুত তুমি তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়, তাহলে ভিলেনতিনার বিরহে তোমার জীবন আযাব হয়ে দাঁড়াবে।”

কণ্ঠটি নিশ্চুপ হয়ে গেলে ফয়জান ভাবতে লাগল, “বৃদ্ধ চিত্রকরটি এত গভীর রাতেও আমাকে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেবে না।”

সে কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভিলেনতিনার দিকে তাকাল, যার যাদুকরী চোখ দুটো ফয়জানের মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে মিটিমিটি হাসছে। সে মৃদুস্বরে ফয়জানকে লক্ষ্য করে বলল, “ফয়জান! আমি তোমাকে মোবারকবাদ জানাতে এখানে এসেছি, তোমার পবিত্র সফরের সূচনাকে ধন্যবাদ জানাই। না জানি, কতদিন ধরে আমি সেই সফরের অপেক্ষা করে আসছি।”

ফয়জান আবেগাপ্লুত হয়ে ভিলেনতিনার হাতখানাকে নিজের কাছে টেনে নিল। খোবানীর বৃক্ষ থেকে তার হাতের উপর হঠাৎ বৃষ্টির ধারার মত শিশির বর্ষন হতে লাগল। সে ইচ্ছে করল শিশিরে ভেজা হাতখানা পরিষ্কার করে নিতে; কিন্তু যেই সে নিজের হাতখানা ভিলেনতিনার হাত থেকে সরিয়ে নিল, ভিলেনতিনা শুন্যে মিলিয়ে গেল।

“ভিলেনতিনা! ভিলেনতিনা!!” ফয়জান অস্থির হয়ে ডাকতে লাগল, কিন্তু তার আওয়াজ পাহাড়ে ধক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

দাঁড়িয়ে সে সবদিকে দৃষ্টি ফিরাল; কিন্তু ভিলেনতিনার কোন অস্তিত্ব সে খুঁজে পেল না। ফুলের মত সুগন্ধি ছড়িয়ে সে কোথাও আত্মগোপন করেছে। ফয়জান মস্তক অবনত করল এবং গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। হঠাৎ নিজের কাঁধের উপর কারোর স্নেহের পরশ অনুভব করল। সে ঘুরে তার দিকে তাকাল। বৃদ্ধচিত্রকর তারই সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে!

“বেটা! এই নাও খোবানীর একটি ফুল, আমি রাস্তা হতে তোমার জন্য ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। দেখ, শিশিরের বিন্দু এর উপর কত চমক সৃষ্টি করেছে।”

“শিশিরের বিন্দু?” ফয়জান বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চিত্রকরকে দেখতে লাগল। তিনি বলছিলেন ঃ

“বেটা! শিশির তো বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার বস্তু; কিন্তু তুমি তো বিদ্যুতের মত, যে কখনো চমকিত হয়ে, আবার

কখনো বজ্র হয়ে কাউকে স্পর্শ করে। সে কখনো স্থির থাকে না। স্থির সে কি করে থাকতে পারে? যখন সবদিকে অগ্নি বর্ষন হচ্ছে জুলুম ও নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় এখানকার মুসলিম জনতা জেহাদ জেহাদ শ্লোগান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধের ময়দানে । তারা সেই উপত্যকা আর পাহাড়ী অঞ্চলেও ঢুকে পড়বে, যেখানে খোবানীর গাছ থেকে সাদা সাদা শিশিরের বিন্দু পড়তে থাকে।"

ফয়জান গভীর মনোযোগে বৃদ্ধ চিত্রকরের কথাগুলো শুনছিল। তিনি আবার বললেন ঃ

"বেটা! সেই জেহাদের ময়দান এমন যেখানে তুমিও চিরকালীন শান্তি পাবে। জুলুম ও শোষনের অক্টোপাস থেকে তোমার জাতি মুক্তি পাবে। এই জেহাদ ছাড়া তুমি তোমার জাতিকে তার দাসত্বের জিল্লতি ও অপমান থেকে মুক্ত করতে পারবে না।"

এ বলে বৃদ্ধচিত্রকর ফয়জানের দৃষ্টি হতে উধাও হয়ে গেলেন। ফয়জান তার দূর বিস্তৃত দৃষ্টি সীমানায় লাল চানারের বৃক্ষ গজিয়ে উঠতে দেখল, যার নিচে দিয়ে টাটকা রক্ত উথলে উঠতে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই সব রক্ত সে সব মজলুম আফগানের যাদের রুশ হানাদার ও তার সেবাদাস বারবাক কারমাল বাহিনী একমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে হত্যা করেছে।

জেহাদের পথে

হঠাৎ তার মনে হল কে যেন আস্তে আস্তে দরজায় আঘাত করছে। তারপর মনে হল অতি সন্তর্পণে কেউ ভিতরে ঢুকছে। আগন্তুকের অবয়বটি ফয়জানের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। তবুও সে বুঝতে পারল, অবয়বটি কে। কিছুক্ষণ পর ছায়াটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মনে হল যেন তিনি তার ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করার জন্যই এখানে এসেছিলেন।

ফয়জানের মনে হল যেন কেউ তার কানে ধীরে ধীরে কিছু বলছে। ক্রমে সেই কথাগুলো স্পষ্টভাবে তার কর্ণকুহরে বেজে ওঠছে।

"ফয়জান ! জেহাদই হচ্ছে তোমার পথ, জেহাদই হচ্ছে মুক্তির পথ।" কণ্ঠটি ক্রমে উঁচু হচ্ছিল। হঠাৎ ফয়জানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে নিজেকে খাটের উপর শোয়া অবস্থায় পেল। তাহলে সে এতক্ষণ ভরে স্বপ্ন দেখেছে! সে অস্থির চিত্তে বিছানা ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল।

খোস্ত শহরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছিল। মসজিদটি সেনাছাউনীর বাইরে। ফয়জান বরফের মত ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করল। তারপর রুমের এক কোণে জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন আফগান সেনা নামায পড়তে চাইলে তাকে গোপনে এবং একা একাই নামায পড়তে হয়। কারণ, নামাযীদেরকে রাশিয়ানরা

ও রুশ সমর্থক আফগান অফিসাররা সুনজরে দেখে না; তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে এবং টার্গেট করে রাখে।

নামায শেষে ফয়জান যখন দোয়ার জন্য হাত ওঠাল, অকস্মাৎ তার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে গেল। কে জানে কতক্ষণ সে অশ্রু বর্ষন করল। সে আল্লাহর কাছে রোদন করে বলছিল ঃ

"হে আমার পরওয়ারদেগার! আজকের রাতই যেন আমার জন্য এখানকার শেষ রাত হয়। হে আমার রব! হে গাফুরুর রাহীম! তোমার এই দুর্বল ও কমজোর বান্দা তোমার দরবারে হাত ওঠিয়েছে। তুমি তার হাতকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

"হে মহা শক্তিমান প্রভু! আমাকে সাহস দাও, মনোবল দান কর। আমাকে তৌফিক দাও, যে স্পৃহা, উদ্দীপনা আর শপথ নিয়ে মস্কো থেকে এখানে এসেছি তা যেন পূরণ করতে পারি। হে আমার মালিক! আমার মধ্যে দৃঢ়তা ও শক্তি দান কর। আমার জন্য সংকীর্ণ পথকে প্রশস্ত করে দাও। হে মাওলায়ে কারীম! আমাকে হিম্মত দাও যেন আমি-- যেন আমি---" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অবিরাম তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার আওয়াজ কণ্ঠনালীতে আটকে গিয়েছে। সে আর কিছু বলতে পারল না। অস্থির হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। জায়নামাযও তার চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ যেন তার চোখের পানি থেমে গেল। নিজেকে অনেক হালকা মনে হল। যেন তার মাথা থেকে অনেক ভারী একটা বোঝা সরে গেছে।

কোন অদৃশ্য শক্তি তার ভেতরে যেন এক অনুভূতি দিচ্ছে, খোদার দরবারে তার কান্নাকাটি কবুল হয়েছে।

সে ওঠে দাঁড়াল।

সবে মাত্র জায়নামাযটি ভাঁজ করে এক জায়গায় রাখছে, দরজায় খটখট করে উঠল। ফয়জান তাকে আসতে বলল। একজন চৌকস সেনা ভিতরে এল। তার হতে রয়েছে টাইপ করা একখানা কাগজ। কাগজখানা ফয়জানের সামনে সে মেলে ধরল স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য। সেটা ছিল একটি অবহিতি পত্র। নাস্তার পরপরই এক

গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশনে খোস্ত গ্যারিসনের সমস্ত জুনিয়র, সিনিয়র অফিসারকে ডাকা হয়েছে। অধিবেশনে তাদেরকে এই এলাকার অবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিং দেওয়া হয়। তাদেরকে অবহিত করা হয় যে, আফগান সরকারী বাহিনী ও মুজাহিদরা কে কোথায় নিজ নিজ নিরাপত্তার খাতিরে সতর্কতা হিসেবে মাইন পেতে রেখেছে। সাথে সাথে নিরাপদ পথগুলোও মিটিংয়ে চিহ্নিত করা হয়।

এই অধিবেশন ডাকার প্রধান কারণ ছিল, কিছুদিনের ভিতর মুজাহিদীনের সবচেয়ে সুরক্ষিত ও প্রধান ঘাঁটি ঝাওয়ার এর উপর একটা বড় ধরনের আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে ব্রিফিং দেয়া।

যখন একজন রুশ কর্নেল দেয়ালে টানানো একটি বিশাল মানচিত্রের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে অধিবেশনে অংশ গ্রহণকারী সামরিক অফিসারদেরকে মাইন-পুঁতা রাস্তাগুলো চিহ্নিত করছিলেন, তখন ফয়জানের মনটা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। সে ভাবেনি যে, আল্লাহ পাক এত তাড়াতাড়ি তার দোয়া কবুল করবে না। সে মনে মনে মহান রাব্বুল আলামীনের অনেক শুকরিয়া আদায় করল এবং একই সাথে তার স্বাধীনতার স্পৃহাও অনেকগুণ বেড়ে গেল।

তার অনেক বড় একটা সমস্যা আল্লাহ তায়ালা অতি সহজে সমাধা করে দিলেন। এখন দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে জেহাদের ময়দানের দিকে পা বাড়াতে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

আজকের রাত বাস্তবিক পক্ষেই তার বন্দী জীবনের শেষ রাত। কাল সকালে সে মুক্ত হয়ে যাবে ভেবে তার মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল।

এই কনফারেন্স থেকে একটা গুরুতর ব্যাপারও সে জেনে ফেলল যে, যেমনভাবে আফগান সরকারী সেনাদের মধ্যে মুজাহিদীনের সহযোগী ও চর রয়েছে, যারা প্রতিটি মুহূর্তে মুজাহিদদের কাছে সরকারের পরিকল্পনার খবর পৌঁছে দেয়, ঠিক তেমনি মুজাহিদদের ভিতরও সরকারী চর রয়েছে, যারা মুজাহিদদের পরিকল্পনা সম্পর্কে

রুশ ও সরকারী সেনাদেরকে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সে আগে থেকে জানত, সরকার ও মুজাহিদ গ্রুপ একে অপরের আকস্মিক হামলা থেকে নিজেদের রক্ষার খাতিরে নিজ নিজ পজিশনের আশেপাশে মাইন বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু কোন্ কোন্ পয়েন্টে মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। এজন্য তার মনে আশংকা ছিল, এসব মাইন থেকে উদ্ধার পেয়ে সে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে কিনা। এখন কুদরত স্বয়ং তাকে পালাতে সহযোগিতা করছে। সে জেনে ফেলল, কোন্ পথ দিয়ে সরকারী সেনারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছে। সেই পথটিই ছিল নিরাপদ। ফয়জানও সিদ্ধান্ত নিল সেই পথ দিয়েই সে পালাবে।

।। ২ ।।

সেদিন সন্ধ্যার পর ফয়জানকে একটি সেকশন সঙ্গে নিয়ে "রেকী" করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সেকশনে তার সাথে একজন হাবিলদার ও একজন আসকারী ছিল। হাবিলদারটি ছিল মধ্য বয়সী। স্থানীয় হওয়ার কারণে এ এলাকা সম্পর্কে তার ছিল যথেষ্ট জ্ঞান।

যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী তারা শত্রুর এলাকা পর্যবেক্ষণ করে অবস্থা নির্ণয় করবে। এই পর্যবেক্ষণ টীমের রিপোর্টকে ভিত্তি করে তবেই আক্রমণের বিশদ প্লান গ্রহণ করা হবে।

এই ডিউটিকে জুনিয়র অফিসার ফয়জান "আল্লাহর মহান দান" মনে করে সানন্দে গ্রহণ করল।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই সহযোগীর সাথে সে তার মিশনে বেরিয়ে পড়লো। ফয়জান জেনে-শুনে নিজের একজন সঙ্গীকে এল, এম, জি আর অন্যজনকে রকেট লাঞ্চার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তার অভিপ্রায় ছিল, এভাবে তার মাধ্যমে মুজাহিদদের হাতে কিছু আধুনিক অস্ত্র পৌঁছবে। তার দুজন সহযোগী সৈনিক বিনা বাক্যে তার নির্দেশ পালন করছে। এ

কাজটি ফয়জান এত তড়িৎগতি এবং সর্তকতার সাথে করছে যে, তাদের খোস্ত দূর্গ থেকে বের হওয়া পর্যন্ত ঘূর্ণাক্ষরেও উপরের অফিসাররা জানতে পারল না, পর্যবেক্ষণ টীম কী ধরনের অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে।

ফয়জান এমনিই ছিল কোম্পানী কমান্ডার। কোম্পানীর সীমানা পর্যন্ত বেশ কিছু ব্যাপারে তার ছিল স্বাধীনতা।

খোস্ত বাজারের বাইরে দিয়ে চক্কর কেটে তারা "বাড়ীর" দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। এই "বাড়ী" নামক জায়গাতে তাদেরকে রেকীও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার সহযোগী সেই দুজন আফগান সৈনিক তার আগে চলছে। আর ক্লাশিনকোভ হাতে নিয়ে ফয়জান তাদের পিছনে পিছনে আসছে।

হাবিলদার ছিল খুবই সতর্ক। সে এই অঞ্চলের প্রতিটি উঁচুনিচু সম্পর্কে খুব ভাল মত জানত। এক জায়গায় পৌঁছে সে থেমে গেল। এ পর্যন্ত এলাকাই রেকী করার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছিল। এখান থেকে তারা পুণরায় খোস্ত গ্যারিসনে চলে যাবে।

"থেমো না; সামনে চলতে থাক।" সৈনিক দুটি যেইমাত্র পিছনে ঘুরতে চাইল কমান্ডার ফয়জান তাদের এই নির্দেশ শুনাল। উভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফয়জানকে দেখল। ফয়জান উগলু ক্লাশিনকোভ তাদের দিকে তাক করে রেখেছিল। ফয়জান মিশনে বের হওয়ার সময় সতর্কতা হিসেবে ক্লাশিনকোভের লক খুলে রেখেছিল, যেন যেকোন উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়।

"দেখো তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন দুর্ভিসন্ধি নেই। আমি কাফের, মুরতাদ ও নাস্তিক সরকারের চাকুরীর উপর হাজার বার লানত করছি। আমি মুজাহিদদের সঙ্গে মিলে পরচম, খালকী ও রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। আমি তোমাদেরকে বাধ্য করবো না আমার সঙ্গ দিতে। তবে তোমাদের কাছে যে সব অস্ত্র আছে, আমি এগুলো পুনরায় কাফেরদের হাতে যেতে দেবো না। তোমাদেরকে এসব হাতিয়ার বহন করে আমার সাথে চলতে হবে। যখন আমি বুঝতে পারবো যে, এসব অস্ত্র এখন অনায়াসে

মুজাহিদদের হাতে পৌঁছে যাবে, ঠিক তখনি তোমাদেরকে ফিরে যেতে দিতে পারি। এর আগে নয়। এজন্য আমি দুঃখিত।”

“হে আল্লাহ ! তোমার হাজার শোকর।” ফয়জান উগলুর কথা শেষ হতেই হাবিলদারটি বলে ওঠল।

“আমিও আপনার সঙ্গী” দ্বিতীয় সৈনিকটি বলল।

মাটির উপর অস্ত্র রেখে তিনজনই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করল। তাঁরা সবাই আনন্দে আত্মহারা, জমিনের উপর যেন তাদের পাগুলো পরছিল না। খানিক পরেই তারা গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে গেল।

।। ৩ ।।

দুজন সহযোগী সৈনিক এজন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে যে, তাদের মনের আশা পূরণ হচ্ছে। আর ফয়জান আনন্দিত। কারণ তার সহযোগীরা তার জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

ফায়জান এখন নিজে তাদের পথ প্রদর্শক হয়ে আগে আগে চলছে। সেদিনকার অধিবেশনে যে মানচিত্র ধরে তাদেরকে ব্রিফিং দেওয়া হয়েছিল সেই ম্যাপটি তার চোখে ভাসছে। ফয়জান তার স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য সে বার বার পিছন ফিরে বৃদ্ধ হাবিলদারের দিকে তাকাচ্ছে। কারণ এই এলাকার প্রতিটি উঁচু-নীচু সম্পর্কে এ বৃদ্ধ ওয়াকিফহাল। সমস্ত রাত তারা পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে সফর করল। পূর্ব আকাশে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লে তারা পাহাড়ের একটি গুহায় চুপ করে বসে যাচাই করতে লাগল, তারা কোথায় এসেছে। তারা বুঝে কুলিয়ে ওঠতে পারল না, তারা কোথায় এসেছে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হল যে, তারা মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পৌঁছে গেছে।

।। ৪ ।।

"কাবুল মারকাজ" থেকে কাসেম ঈশানজাদা ও মোল্লা মীরদাদ খান গতকালই এখানে পৌঁছে গিয়েছেন। হাজী আমানুল্লাহ রাজধানী কাবুলের আশেপাশে হামলা জোরদার করার জন্য সেখানকার কমান্ডারদের একটি বিশেষ মিটিং ডাকেন।

"বাড়ী মারকাজে" কাসেম ঈশানজাদা ফজরের নামায পড়ে মর্নিং ওয়াক করার জন্য হাঁটতে হাঁটতে একদিকে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধে তার ক্লাশিনকোভ ঝুলছে। হাতে দূরবীন। দূরবীনটি গতকালই হাজী আমানুল্লাহ তাকে দিয়েছেন।

কাসেম ঈশানজাদা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দূরবীনটি চোখে লাগালেন। দূরবীনটি "তুরগার" থেকে যে সড়কটি এসেছে, সে দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দূরবীন উত্তর-দক্ষিণে ঘুরাতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি থমকে গেলেন। তিনজন আফগান সেনাকে চুপে চুপে এদিকে আসতে দেখা গেল। কাসেম ঈশানজাদার প্রথম ধারণা হল, এরা হয়ত শত্রুদের টহল পার্টি, যারা রাস্তা ভুলে গিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। ক্ষণিকের জন্য তিনি কিছু ভাবলেন। তারপর মারকাজের দিকে দৌড়ে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোল্লা মীরদাদ খান তার তিনজন মুজাহিদ সহচর নিয়ে সে দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দূরবীনের সাহায্যে তারা আগন্তুকদের পথ ও দিক নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিন মুজাহিদ বিড়ালের মত নিঃশব্দে পার্বত্যে অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারা আগন্তুকদের পিছু নেওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মীরদাদ খান তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি অন্য পক্ষ ভুল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে তাদের উপর যেন গুলী না চালানো হয়।

মীরদাদ খান কাসেম ঈশানজাদার সঙ্গে একটি নিরাপদ ও উঁচু স্থানে বসে গেলেন, যেখান থেকে পুরো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়। তিনি দূরবীন চোখে লাগালেন। তিনি আবার চোখ থেকে সেটা

নামিয়ে নিলেন। আগন্তুকরা নির্ভয়ে তাদের দিকেই আসছে। কাসেম ঈশানজাদা ক্লাশিনকোভের লক খুলে গান সোজা করলেন।

"এর প্রয়োজন নেই কাসেম ! আগন্তুকরা আমাদের লোক মনে হয়। আমার মন বলছে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বিশেষ মেহেরবানী করেছেন।" মীরদাদ খান হাত উপর উঠিয়ে কাসেমকে বারণ করে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন আফগান সৈনিক মুজাহিদদের সামনে আত্মসমর্পণ করল। হাজী আমানুল্লাহ রকেট লাঞ্চার ও এল, এম, জি মুজাহিদদের হস্তগত হওয়াতে দু'রাকাত শুকরানা নামায পড়লেন। ফয়জান উগলুর আগমনকে তারা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য হিসেবে ধরে নিলেন। মুজাহিদদের তখন হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা স্মরণ হতে লাগল।

দুপুর পর্যন্ত তারা মুজাহিদদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। অতঃপর বাদ জোহর হাজী আমানুল্লাহ খানের অনুরোধে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তারা শুয়ে পড়ল। তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত তারা কখনো জেগে কখনো ঘুমিয়ে কাটাতে লাগল। ফয়জানের মাঝে মধ্যে নিজের বাড়ীর লোকদের কথা মনে পড়তে লাগল। সে জানত, সেনাবাহিনী থেকে তার পালানোর পর খাদ ও কেজিবি তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে।

কিন্তু!

কুরআনুল কারীমের সে সববাণী তার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট ছিল, যাতে রয়েছে, 'যারা আল্লাহর পথের পথিক, তাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যারা সেই পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করবে এবং দৃঢ় পদ থাকবে একমাত্র তারাই সফলকাম হবে।'

এ দিকে একজন আফগান সেনা অফিসারের আত্মসমর্পনের খবর মুজাহিদদের নিকটতম মারকাজগুলোতেও পৌঁছে গিয়েছিল। সেসব মারকাজের কমান্ডাররা সেই নবাগত মুজাহিদকে দেখার জন্য এবং তার কাছ থেকে আফগান সরকারের প্লান জানার জন্য তারা "বাড়ী মারকাজে" পৌঁছতে লাগল।

মাগরিবের পর জুনিয়র অফিসার ফয়জান উগলু জিহাদী পোশাকে মুজাহিদীনকে আফগান ও রুশ সেনাদের ঝাওয়ার কেন্দ্রের উপর হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফিং দিল। মুজাহিদরা ও সরকারী সেনাদের মধ্যে লুকানো তাদের হিতাকাঙ্খীদের মারফত এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফয়জান উগলুর মাধ্যমে তারা শত্রুদের বিশদ পরিকল্পনা জানতে পেরে আরো সতর্ক হয়ে গেল।

ফয়জানের বক্তব্য শেষ হলে হাজী আমানুল্লাহ জান মুজাহিদদেরকে এখন থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং সমস্ত বাংকারে মুজাহিদদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে বললেন। ফয়জানের সহচর বৃদ্ধ হাবিলদারটি রকেট লাঞ্চার কাঁধে ওঠিয়ে মুজাহিদদের একটি গ্রুপের সাথে খোস্তের পথে রওনা হয়ে গেল।

তারা সম্ভাব্য ট্যাংক বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য রকেট লাঞ্চার ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। যাত্রা শুরু করার পূর্বে সেই হাবিলদারটি ফয়জানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বলল, "বেটা! তুমি আমার জীবনের ধারা পাল্টে দিয়েছ। আমাকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছ। আল্লাহ তোমার এই সৎকর্মের অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবেন। দোয়া কর। এখন আমি জেহাদে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ যেন আমার জেহাদকে কবুল করে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।" ফয়জানের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সে "আমীন" বলে তার উদাস মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

ফয়জান হাজী আমানুল্লাহ জানের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে "ঝাওয়ার মারকাজের" দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাতের প্রথম প্রহরে ঐ এলাকায় জেহাদরত মুজাহিদদের সব দলের কমান্ডাররা ঝাওয়ার মারকাজে সমবেত হল। ফয়জান উগলু তাদেরকে পুনরায় সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিফিং দিল।

সে তাদের সামনে প্রস্তাব রাখল, যেন শত্রু বাহিনীর আক্রমণের পূর্বেই তাদের উপর আঘাত হানা হয়। কিন্তু, ফয়জান হয়ত জানে

না, তাদের কাছে জেহাদী জযবা ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু নেই। সে এখানে এসে পরে বুঝতে পারল বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যে সংবাদ প্রচার করছে, আমেরিকা মুজাহিদদেরকে অজস্র অস্ত্র দিচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদেরকে সাহায্য করছে, এসব আংশিকও ঠিক নয়; এগুলো হচ্ছে মিডিয়াগুলোর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা।

বাস্তব তার উল্টো। মুজাহিদদের কাছে যে সব অস্ত্র রয়েছে তার বেশীর ভাগ হচ্ছে শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। তবে কিছু হিতাকাঙ্খী মুসলমান সামান্য হালকা অস্ত্র কিনে মুজাহিদীন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া বহির্বিশ্বের যে সাহায্যটুকু মুজাহিদীন পেয়েছেন সেটা হল তাদের প্রতি মৌখিক ও নৈতিক সমর্থন, অন্য কিছু নয়। এই বৈঠকে ফয়জান উগলু প্রস্তাব রাখল যেন মাঝারি পাল্লার অস্ত্রসস্ত্র হস্তগত করার জন্য খোস্ত বাজারের একটি অস্ত্রাগার লুট করা হয়। তার প্রস্তাবের সাথে সকলে ঐক্যমত পোষণ করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হল এবং আগামী রাতকে অভিযানের জন্য নির্বাচিত করা হল।

হাজী আমানুল্লাহ জান সবার রায় নিয়ে এই আক্রমণের জন্য ফয়জান উগলুকে কমান্ডার নিয়োগ করলেন।

গন্তব্যস্থলের মুসাফির

পরের দিনটি তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। কাল পর্যন্ত সে ছিল আফগান সরকারী সেনা অফিসার। আজ সে মুজাহিদদের কমান্ডার হয়ে নাস্তিক ও বেদ্বীন সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিব নামায আদায় করেই তারা তাদের মিশনে বেরিয়ে পড়ল। খোস্ত বাজারের বাইরেই ফয়জান তার সঙ্গীদেরকে থামতে বলল। সে পুরো অবস্থা যাচাই করে তবেই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাচ্ছে।

এই অভিযানে ফয়জানের সঙ্গে এসেছেন চারজন মুজাহিদ। তাদের কাছে রয়েছে মাত্র দুটি রাইফেল, আর রয়েছে অস্ত্রসস্ত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু উপকরণ।

ফৌজী ট্রেনিং অনুযায়ী ফয়জান স্বয়ং নিজে অস্ত্রাগারটি ভালমত দেখে নিল। অস্ত্র ডিপোটি কেল্লার বাইরে একটি নিরাপদ স্থানে অবস্থিত। অস্ত্রাগার পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে রয়েছে তিনজন সান্ত্রী। ফয়জান জানে, সান্ত্রীদের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথে আর্মড ফোর্সেস তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। ফয়জান ভাবতে লাগল, কী উপায়ে সেনাবাহিনীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করে রাখা যায়!

পরক্ষণেই সে একটা বুদ্ধি স্থির করে ফেলল।

সে সঙ্গীদেরকে ডিপোর কাছে নিয়ে এল। সেখানে পৌঁছে নিজের কোটের পকেট থেকে সে পেট্রোলের একটি বোতল বের করল। বোতলটি সে রওনা দেবার সময় এই উদ্দেশ্য করেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বোতলের মুখে কাপড় ঠুঁসে ফয়জান কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে ডিপোর সামনে দাঁড়ানো সামরিক যানগুলোকে লক্ষ্য করে সে বোতলটি ছুড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গাড়ীগুলোর কাছেই রাখা ছিল পেট্রোল ভরা ড্রাম। আগুনের তাপ যখন সেই পর্যন্ত পৌছল, তখন যেন কেয়ামত এসে গেল। পেট্রোলের ড্রামগুলো আগুনের তাপে বোমার মত বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে বিশাল অগ্নিকুন্ড আসমানকে ছুইতে লাগল। হঠাৎ এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ আর অগ্নিকান্ড দেখে সেখানে হুলস্থুল পড়ে গেল। বিপদ সংকেত বেজে ওঠল। অস্ত্রাগারে মোতায়েন সান্ত্রীরা যেদিকে বিস্ফোরণ হচ্ছিল সে দিকে দৌড় মারল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদেরকে বেশী দূরে অগ্রসর হতে দিল না। তাদের রাইফেল গর্জে ওঠল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের লাশগুলো ভূমিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। এই সুযোগে ফয়জান তার সঙ্গীদেরকে ইশারা করলো অস্ত্র ডিপোতে ঢুকার জন্য। তারা অস্ত্রাগারে ঢুকে কয়েক মিনিটের মধ্যে অস্ত্র বোঝাই করে ডিপো থেকে বেরিয়ে এলো। ফয়জান তাদের নেতৃত্ব দিয়ে আগে আগে চলল। আগুনের আলোয় শত্রুবাহিনী তাদেরকে দেখে ফেলতে পারে এই ভয়ে তারা একটা দীর্ঘ কিন্তু নিরাপদ রাস্তা গ্রহণ করল।

ফয়জান ভাবছিল, যে পথ দিয়ে সে তার মুজাহিদ বন্ধুদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, শত্রুবাহিনী কোন ক্রমেই তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু, সে মোটেও জানতে পায়নি যে, ফয়জান যখন পালাচ্ছে, তখন তারই কোম্পানীর একজন সৈনিক তাদেরকে দেখে ফেলেছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে, সে তার সাবেক অফিসারের উপর গুলি চালানোর সাহস পেল না। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফয়জান তার দলবল নিয়ে তার আওতার বাইরে চলে গেল। আগুনের বহ্নিশিখায় খোস্ত দূর্গের সৈন্যরা হতচকিত হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে কেউ চিৎকার করে বলে ওঠল "হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! মুজাহিদরা হামলা করেছে।"

মুজাহিদরা এ সব নাস্তিক ও বেদ্বীন লোকের স্নায়ূর উপর আতংক হয়ে চেপে বসেছে। গত দু'বছর ধরে মুজাহিদরা এমন সব কল্পনাতীত এবং বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে, এখন কোন এলাকায় তাদের উপস্থিতির কথা শুনলেই রাশিয়ান ও আফগান সৈনিকদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যায়। রুশ সৈন্যরা এমন মুহূর্তে কখনো বাইরে বের হয় না। এখনো তারা তাই করল। তারা দূর্গ হতে বের হল না। আফগান সরকারী সেনাদের বাইরে পাঠান হল শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। কিন্তু শত্রু তো তাদের আওতা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কমান্ডার ফয়জান উগলু আর তার সঙ্গীরা খুব দ্রুতগতিতে সফর করে সারি সারি পাহাড়ের আড়ালে উধাও হয়ে গিয়েছে। তবে যাওয়ার মুহূর্তে সে ডিপো হতে যে সব হাত বোমা সঙ্গে করে নিয়েছে তারই কয়েকটি দ্বারা পুরো ডিপোটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দিয়েছে। এমনিতে রাতের আঁধারে মুজাহিদদের পিছু নেওয়ার মত ঝুঁকি নিতে সৈন্যরা মোটেও সাহস পায় না। কারণ, তারা সবাই জানে, মুজাহিদরা পালানোর মুহূর্তে তাদের পিছু নেয়া সৈন্যদের ঘায়েল করার সুবন্দোবস্ত করে থাকে, যা হয়ে থাকে খুবই অতর্কিত ও অপ্রতিরোধ্য। রাতের আঁধারে গুলী কোন্ দিক থেকে আসছে নির্ণয় করার আগেই মৃত্যু তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়।

ভোরের আলো ফুটে উঠার আগেই মুজাহিদরা নিজেদের মারকাজে চলে এল। এই অপারেশনে প্রথমবার মুজাহিদদের হাতে প্রচুর অস্ত্র-সস্ত্র চলে এল। এর পুরো কৃতিত্বই হচ্ছে কমান্ডার ফয়জান উগ্লুর। মুজাহিদদের সাথে যোগ দেওয়ার পর এটাই তার প্রথম অভিযান। তার এ সাফল্যের কারণে সমগ্র মুজাহিদদের অন্তরে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে! ভোর হওয়ার আগেই শত্রুদের ক্যাম্পে দাবানলের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, রাতের আঁধারে মুজাহিদরা যে হামলা

করেছিল, তার কমান্ড করেছে সাবেক আফগান সেনা অফিসার ফয়জান উগ্‌লু। সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

মোল্লা মীরদাদ খান কাবুল মারকাজে রওনা হলে হাজী আমানুল্লাহ্ জান ফয়জান উগ্‌লুকেও তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভাল করেই জানেন, এধরনের মুজাহিদের কোন্ রণাঙ্গনে বেশী প্রয়োজন হয়।

কিছু দিন যেতে না যেতেই কাবুলের পাহাড়-পর্বত, অলি-গলি একটি নামেই মুখরিত হয়ে উঠল-মুজাহিদ ফয়জান উগ্‌লু।

আখুন্দজাদাকে হত্যা করার পর মেজর উরখান ফয়জানকে গ্রেফতার করে। সে যখন মস্কো থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়ে কাবুল ফিরে খাদ ও কেজিবির হাতে গ্রেফতার হয়ে নির্যাতনের শিকার হয়, তখন মেজর উরখানই তাকে ছলে-বলে-কৌশলে কমিউনিজমের মন্ত্রে আবার ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু ফয়জান উগ্‌লু সত্যিই কি কমিউনিজম গ্রহণ করেছিল? কখনই না, সে কেবল খাদ ও কেজিবির ছোবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়ে উরখানের কথায় রাজি হয়েছিল। কিন্তু মেজর উরখান সহ সকল ফৌজী অফিসারের এটা ছিল ফয়জানের প্রতি সু-ধারণা মাত্র। আজ যখন সে আবার খাদ-এর ছোবল থেকে বের হয়ে পালাল, তকদীরের কি খেলা! সে মেজর উরখানের ঘরেই গিয়ে পড়ল। কিন্তু ইয়াসমীন?

সে ভাবতে লাগল। ইয়াসমীনের সঙ্গে আবার তার সাক্ষাত হয়ে গেল। কিন্তু এতো ইয়াসমীনের ভিন্নরূপ। তবে কি ইয়াসমীনও পাল্টে গেছে!

গায়েবী সাহায্য

ইয়াসমীন স্পষ্টভাবেই অনুভব করতে পারছে, যে স্বপ্ন সে দেখে আসছে সেটা রাশিয়ায় এসে একেবারেই চুরমার হয়ে গেছে। বিশেষ করে ফয়জানের অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাতে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। পড়ালেখা থেকে তার মন একেবারেই ওঠে গেছে। ফয়জান মস্কো ত্যাগ করার মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে আসেনি। এ ব্যাপারটি তার ভিতরকে খান-খান করে দিয়েছে। সে এখন পার্টির মিটিং এ অংশ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সারাটা দিন নিজের রুমে শুয়ে কাটাচ্ছে। একটা অজানা অনুশোচনা তার প্রাণ বিষিয়ে তুলছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও মানসিক টেনশনে পড়ালেখা তো দূরের কথা; তার শরীর শুকিয়ে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নানা রোগ তাকে ঘিরে ধরছে।

পার্টির মিটিং থেকে টানা অনুপস্থিত থাকার কারণে তার কমরেড সঙ্গীদের মনে এই আশংকা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, ইয়াসমীন আর কমরেড নেই। সে মত পরিবর্তন করে ফেলেছে। যদি সে রাশিয়ার নাগরিক হত তাহলে তাকে এ অপরাধের জন্য চরম মাশুল দিতে হত।

কিন্তু যেহেতু সে বিদেশী স্টুডেন্ট, আর তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিলে হয়ত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে-এজন্য রুশ কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল না; বরং

সতর্কতাস্বরূপ ফয়জান উগ্‌লুর চলে যাওয়ার দুই-আড়াই মাসের মধ্যে তাকেও "অবাঞ্ছিত ও অযোগ্য" ঘোষণা করে কাবুল পাঠিয়ে দিল।

।। ২ ।।

মেজর উরখানের মেয়ে যখন দেশে ফিরে এলো, তখন সে আর সেই আগের ইয়াসমীন নেই। ফয়জানের বিরহ যাতনায় তার প্রাণটা কেবলই ছটফট করে। তার হাসি আর আনন্দ কতদিন ধরে বিদায় নিয়েছে। কাবুলের অভিজাত ফ্যামিলীতে তার আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

কোন ফাংশন কিংবা অনুষ্ঠানে আজকাল তাকে মোটেও দেখা যাচ্ছে না। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় তারা তাকে অত্যধিক আদর করেন। উরখান কোন সময়ই মেয়ের উপর কোন ব্যাপারে চাপ দেয়নি। ইয়াসমীনের মা হলেন খুবই ধার্মিক ও পর্দানশীন। সে জন্য শুরু থেকেই তার চেষ্টা ছিল, যেন তার মেয়ে একজন ধার্মিক, আদর্শবান পর্দানশীন মেয়ে হিসেবে গড়ে ওঠে। তিনি তার মেয়ের বেপর্দা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং এখনও করেন না।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, তার মেয়ে এখন মদ ও সূরার আসরেও অংশ নিতে শুরু করেছে। তিনি কেঁদে কেঁদে তার স্বামীর কাছে হাতজোড় করে আবেদন করলেন, যেন এ ধরনের অশ্লীল আসরে যোগদান থেকে তার মেয়েকে ফেরানো হয়; কিন্তু স্বামী উরখানের মাথায় আধুনিকতা আর তথাকথিত প্রগতিবাদ মাত্রাতিরিক্ত চেপে বসেছে। মেয়ের এসব আসরে শরীক হওয়াতে সে বরং মনে মনে আনন্দই বোধ করছে। কাজেই তার স্ত্রী যখন করজোড়ে আবেদন করলেন, তখন তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হল না। বরং উল্টো স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, আগামীতে এধরনের আবদার কখনো করবে না।" বেচারী স্বামীর এরূপ আচরণে খুবই মর্মাহত হলেন।

ইয়াসমীন উচ্চ শিক্ষার জন্য মস্কো চলে গেলে তার মা রোগে-

শোকে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েন। তবে তিনি মারা যাননি। মেয়ের ফিরে আসার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে সত্যিই তার মেয়ে একজন মুসলমান আফগান সন্তান হিসাবে মস্কো থেকে ফিরে আসল। কিন্তু, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার মায়ের আখেরাতের পথে পাড়ি জমানোর একদম অন্তিম মুহূর্ত এসে গিয়েছে। তিনি আসলে মেয়ের বিচ্যুতির পথে পা বাড়ানোর ফলে শোকে-দুঃখে ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তার হৃদয়টা ক্রমাগত মানসিক অস্থিরতায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছিল।

একদিন তার ম্যাসিভ হার্ড এটাক হল। মেজর উরখান দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা অবস্থা দেখে বললেন, রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে মারাত্মক অবহেলা করা হয়েছে। এখন ওষুধের চেয়ে তার দোয়ারই বেশী প্রয়োজন।

ইয়াসমীন পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করল, তার মা যেন প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তকদীরের বিরুদ্ধে তো কারোর কিছু করার নেই। তার মা তাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

তবে মৃত্যুর সময় মায়ের মনে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, যাক অবশেষে তার স্নেহের ধনটি সুপথে ফিরে এসেছে, সিরাতে মুস্তাকীম খুঁজে পেয়েছে।

মায়ের মৃত্যুতে ইয়াসমীন গভীর শোকে ভেঙ্গে পড়ল। সে মায়ের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করল। ভেবেভেবে মায়ের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হল। তার উচ্ছৃঙ্খলপনা ও সীমাতিরিক্ত প্রগতি প্রেমই মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার ইসলাম বিরোধী কাজের জন্যই জন্মদাত্রী মা কঠিন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এসব কথা চিন্তা করে ইয়াসমীন কয়েকবার কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসাল। সে যতই এসব নিয়ে ভাবতে লাগল, কমিউনিজম আর তথাকথিত প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে তার বিতৃষ্ণা তত বেড়ে চলল।

একদিন যখন সে শুনতে পেল, রাশিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী তাদের বন্ধু সরকারকে রক্ষার জন্য আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে,

তখন তার ভিতরে যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু একজন অসহায় অবলা নারী কি-ইবা করতে পারে! মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে পর পর দুজন প্রেসিডেন্ট সরদার দাউদ খান এবং নুর মুহাম্মদ তারাকাঈ এই নতুন বিপ্লবের বলির শিকার হন। দেশের অবস্থা একেবারে পাল্টে যায়। রাজধানী কাবুলের রাতগুলোতে এখন সব সময় কারফিউ লেগে থাকে।

জনগণ একজন আরেকজনের সম্পর্কে হয়ে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। এখানকার মানুষগুলো হচ্ছে সরল প্রকৃতির ও খাঁটি মুসলমান। তারা মনের কথা মনের ভিতর চেপে রাখতে অভ্যস্ত নয় বরং তা প্রকাশ করবেই। তাদের মধ্যে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদ আফগান কমিউনিস্ট নাস্তিক সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধ আর ঘৃণা দিনে দিনে বেড়েই চলছে।

প্রতিদিনই খবর পাওয়া যাচ্ছে, আফগান যুবকরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পাহাড়ে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে দেশী রাইফেল। এই শপথ নিয়ে তারা ঘর থেকে বেরুচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যবাদকে তাদের পবিত্রভূমি থেকে বিতাড়িত না করবে, তারা স্বগৃহে ফিরবে না।

এসব যুবকের নাম আর বীরত্বে শীঘ্রই আফগানিস্তানের পাহাড়-পর্বত আর অলি-গলি মুখরিত হয়ে উঠল। সে সব মুজাহিদের মধ্যে ফয়জান উগ্‌লুর নামটিও আছে।

একদিন ফয়জানের নামটি ইয়াসমীন তার বাবার মুখে শুনে চমকে উঠল। তার বাবা রাগে পাক খেতে-খেতে ঘরে এল। তার চোখ মুখ ক্রোধে-আক্রোশে লাল হয়ে আছে। ইয়াসমীন বাবার এ অবস্থা দেখে শংকিত হয়ে উঠল। বাবা কিছুটা শান্ত হলে নিজেই বলে উঠল, "মা! আজ ফয়জান নামের এক যুবক আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেজন্য রাশিয়ান কর্ণেল আমাকে ধমক দিয়ে যা তা বলেছে! সে আমাকে অকর্মা, দায়িত্ব জ্ঞানহীন বলে গালাগাল করেছে। কোন আফগানী এ ধরনের গাল বরদাশ্‌ত করবে না।" ইয়াসমীন চুপ করে রইল।

একদিন পত্রিকাতে ফয়জানের ছবিসহ একটি খবর ইয়াসমীন দেখতে পেল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কাবুলের একটি ভরা বাজারে মানুষের সামনে একজন রুশ সেনা অফিসারকে ফায়জান গুলী করে হত্যা করে বীরদর্পে পালিয়ে গেছে। কেউ তার শরীর স্পর্শ করতে পর্যন্ত সাহস পায়নি। ইয়াসমীন মাঝে মাঝেই ফয়জানের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের এ ধরনের সংবাদ শুনতে পায়। কয়েকবার রুশ ও তার সেবাদাস আফগান সরকারের সেনাদের হাতে ধরা পড়েও বেঁচে গেছে শুনে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ফয়জানের জন্য তার মনের গভীর থেকে উষ্ণ দোয়া বেরিয়ে আসে।

বেশ কিছু দিন ধরে তাদের ঘরে ফয়জানের নামটি বেশী বেশী আলোচিত হচ্ছে। ঘরে সে, তার বাবা ও চাকররা থাকে। কিন্তু কাবুলের এই আধুনিক এবং অভিজাত এলাকার অনেক পরিবার ও ব্যক্তিবর্গ তাদের বাসায় আসা-যাওয়া করে। কারণ, তার বাবা একজন সামরিক অফিসার। তাদের আলোচনার মধ্যে ইয়াসমীন অনেক সময় ফয়জান উগ্‌লু এবং অন্য মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনার খবর শুনতে পায়। রাজধানীর প্রতিটি ঘরে মুজাহিদদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী নিয়ে আলোচনা চলে এখন।

অনেকে তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। আবার অনেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ লালন করে। তবে শত্রু-মিত্র সবাই মুজাহিদদের বীরত্ব ও ঈমানী শক্তিকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে। সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মুজাহিদরা নিরস্ত্র হওয়া সত্বেও একটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে অমিত শৌর্যবীর্য ও অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

আজ ইয়াসমীন বার বার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। কারণ ফয়জান রুশ ও আফগান কমান্ডো সেনাদের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের ঘরে আশ্রয় নিতে এসেছে।

।। ৩ ।।

ইয়াসমীন কখনো কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি, এভাবে হঠাৎ

ফয়জান জীবনে আবার কখনো তার মুখোমুখী হবে। ফয়জানও ভাবেনি, সে যে ঘরটিতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে, সেখানে ইয়াসমীন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

মেজর উরখানের হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল! সে তার মেয়ের ধমকের মধ্যে বড় ওজন অনুভব করতে পারছে। তার অতীত অভিজ্ঞতা তাকে মনুষ্য কণ্ঠের পিছনে লুকানো বাস্তব সত্যকে বুঝার শক্তি দিয়েছিল। ইয়াসমীন যেভাবে আচমকা তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করেছে, আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, প্রয়োজনে সে বাবার প্রতি গুলীও চালিয়ে দিতে পারে!

"ফয়জান! পিস্তলটা ওঠিয়ে নাও।" সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফয়জানকে তার বাবার পিস্তলখানার দিকে ইংগিত করে বলল।

ফয়জান কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর পিস্তলটা ওঠিয়ে নিল। "বাবা! আমি এজন্য খুবই দুঃখিত যে, আপনার উপর আমি পিস্তল তাক করেছি। আমার জায়গায় যদি অন্য কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আফগান মেয়ে হত, তাহলে সেও এমনই করত যা আমি করেছি। কারণ এই ব্যক্তিটি আমাদের ঘরে আশ্রয় নিতে এসেছে। আর কোন পাঠান তার কাছে আশ্রয় গ্রহণকারীকে কিছুই বলে না, সে তার বাপের হত্যাকারীই হোক না কেন। তবুও আশ্রয়প্রার্থীকে মেহমান রূপে বরণ করাই পাঠানদের রীতি।" ইয়াসমীন তার বাবাকে লক্ষ্য করে বলল।

"ইয়াসমীন বেটী! তুমি কি একে চেন?" মেজর উরখান মেয়ের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল।

"একে কে না চেনে! এরাই তো হচ্ছে আমাদের পরিচয়। এরা হচ্ছে আমাদের মহান ঐতিহ্য এবং দ্বীনে ইসলামের সত্যিকারের ধারক বাহক; যারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আফগান মুসলমানরা তাদের সুউচ্চ পাহাড়ের মত দুর্ভেদ্য ও অটল। তাদের সঙ্গে টক্কর দেয়ার কেউ নেই।" বলতে বলতে আবেগের তাড়নায় ইয়াসমীনের গলা বন্ধ হয়ে এল।

"মা! আমার কথার এখনো উত্তর দাওনি তুমি।" মেজর উরখান আবারো তাকে লক্ষ্য করে বলল।

"জি আব্বা! আমরা দুজনে একই সঙ্গে কাবুল কলেজে ছিলাম, একই সঙ্গে মস্কো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেছি।" ইয়াসমীন অবশেষে বাবার সামনে স্বীকার করল।

"আপনারা আমার জন্য পেরেশান হবেন না। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব।" ফয়জান এই প্রথম তাদের সামনে মুখ খুলল।

"না ফয়জান! তুমি এভাবে যেতে পারবে না। উরখান আপত্তি করল, তুমি আমার অতিথী, চাকুরী পরের কথা। আমি প্রথমে মুসলমান, তারপর আফগানী। আমাকে মুসলমান হিসেবে প্রথমে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। হায় আফসুস! যদি প্রথম থেকেই আমার চোখ দুটো খুলত এবং তোমাকে গ্রেফতার না করতাম। আহা! আমার জন্য তোমাকে কত বর্বরতার শিকারই না হতে হয়েছে।" মেজর উরখানের কণ্ঠটা ভারী হয়ে এল।

"আমি আপনাদেরকে কোন্ ভাষা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা খুঁজে পাচ্ছি না।"

ফয়জান আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু মেজর উরখান তার কথা কেটে বলল

"বাবা! এসব কথা আবার হবে। তুমি বিশ্রাম নাও। আমি বাইরে গিয়ে পরিস্থিতিটা একটু যাচাই করে আসি।" এই বলে মেজর উরখান বাইরে চলে গেল। সে হঠাৎ করে বাইরে যাওয়াতে ফয়জান মোটেই বিচলিত হল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মেজর উরখান এখন তাকে ধোঁকা দিবে না। মুসলমানদের ঘুমন্ত চেতনাই তো জাগাতে হয়। আর যখন তার ঈমানী চেতনা জেগে ওঠে, তখনই সে সোনার মানুষে পরিণত হয়। ফয়জান অনুভব করতে পারছে, উরখানের সেই ঘুমন্ত চেতনা জেগে উঠেছে। এটা আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্য। সে মনে মনে প্রার্থনা করল, "হে পরওয়ারদেগারে আলম! তুমিই মনের খবর জান। তুমিই অন্তর পরিবর্তনকারী।"

"আমি খুবই দুঃখিত ইয়াসমীন! আমার ব্যবহার দ্বারা তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ। মস্কো ছাড়ার মূহুর্তে তোমাকে বলে পর্যন্ত আসিনি। এজন্য আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।" উরখান বাইরে যেতেই ফয়জান ইয়াসমীনকে লক্ষ্য করে বলল।

"না ফয়জান! তুমি তো আমার জন্য বড় মুহসিন এবং হিতাকাঙ্খী বন্ধু। তুমি যদি সে দিন এরকম স্পষ্টভাবে আমাকে তিরস্কার না করতে, তাহলে না জানি আজ আমি কত অধঃপতনের দিকে চলে যেতাম। বিচ্যুতি ও নির্লজ্জতার এমন অন্ধকারে তলিয়ে যেতাম, যেখান থেকে হয়ত ফিরে আসা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না। তুমি তো সে দিন আমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছিলে। আমাকে নাস্তিক বেদ্বীন হায়েনাদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলে।" তারপর দু'জনে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে বসে মস্কোর অতীত জীবন সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে লাগল।

।। ৪ ।।

কর্ণেল শোলোখোভ রাগে-ক্রোধে পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে। তার সামনে নত মস্তকে দাঁড়ানো সমস্ত সৈনিককে গুলী মেরে উড়িয়ে দিতে। তাদেরই কাপুরুষতা ও অযোগ্যতার কারণে শুধু ফয়জানই তাদের হাত ছাড়া হয়নি; বরং ফয়জানের মুজাহিদ সাথীরা ত্রিশ-পয়ত্রিশ জন সৈন্যকে হত্যা করে কোথায় যে গায়েব হয়ে গেছে। বুঝেই আসছে না, সেই মৌলবাদী গেরিলারা গেল কোথায়! তাদেরকে মাটি খেয়ে ফেলেছে, না আসমান গিলে ফেলেছে?

"গাধার মত কি জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছ! যাও, ফয়জানকে খুঁজে বের কর। কাবুলের সমস্ত রাস্তা এবং অলিগুলিতে আমি পাহারা বসিয়ে দিয়েছি। সে কোথাও যেতে পারবে না, এখানেই রয়েছে। কাবুলেরই কোন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।"

সৈনিকরা কর্নেলের নতুন নির্দেশ পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল। তারা সেখান থেকে কেটে পড়লো। কর্ণেল শোলোখোভ ওখানেই দাঁড়িয়ে

কিছুক্ষন কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ কি মনে করে সে চমকে গেল। দ্রুতপদে নিজের রুমে চলে গেল। ইন্টারকমের রিসিভার টিপে সে তৎক্ষণাত মেজর বুনাকোফকে তলব করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেজর বুনাকোফ সেখানে এসে উপস্থিত হল।

"বুনাকোফ! তোমার সেলে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক অবশ্যই রয়েছে। সে বিদ্রোহী গেরিলাদের চর। তাকে যে কোন ভাবেই হোক অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য আমি তোমাকে বেশী সময় দিতে প্রস্তুত নই। বুঝলে তো, সজাগ দৃষ্টি রাখবে।" শোলোখোভ নিস্প্রভ কণ্ঠে বলল।

বুনাকোফের কোন উত্তর না শুনেই শোলোখোভ "আউট" বললে কর্ণেলকে সে সেলুট মেরে বেরিয়ে গেল।

বুনাকোফ রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে শোলোখোভ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। আচানক সে নিজের কাছে রাখা টেলিফোনে একটি নম্বর ঘুরাতে লাগল। কাবুলের শহরতলী এলাকার একটি সেনা ছাউনীতে ফোনের ঘন্টা বেজে ওঠল। ফোনের রিসিভার ওঠাল ঐ এরিয়ার রুশ কমান্ডার। কর্ণেল শোলোখোভ তাকে কিছু বুঝাল এবং নির্দেশ দিল, "কাল বিলম্ব না করে এখ্‌খুনি সেনা ছাউনীর পাশে যে নতুন অভিজাত এলাকা রয়েছে, সেটা ঘেরাও করে ফেল।"

মাত্র দশ মিনিটের ব্যবধানে ৩০ (ত্রিশ)টি ট্যাংক গর্জন করতে করতে সেনা ছাউনী থেকে বের হল। এগুলোর মুখ তাক করা অভিজাত এলাকার দিকে।

।। ৫ ।।

মেজর উরখান খামোখা বাইরে বেরিয়ে যায়নি। তার সমস্ত জীবনটা সেনাবাহিনীতে কেটেছে। তার সজাগ কান দুটো ট্যাংকের গর্জন শুনতে পেয়েছে। ওদিকে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে ইয়াসমীন ও ফয়জান খামোশ হয়ে গেল। কারণ, বিভিন্ন ধরনের ফৌজি ট্রাক আর ট্যাংকের শব্দ এখন বেশ স্পষ্টভাবে শুনা যাচ্ছে।

ফয়জান ও ইয়াসমীন একজন অপরজনের দিকে তাকাল, যেন তাদের কেউ একজন এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

মেজর উরখান যেমন তাড়াতাড়ি গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশী দ্রুত তিনি ফিরে এলেন। তাকে বেশ বিচলিত দেখা যাচ্ছে। তার বুঝে আসছে না, কি হতে যাচ্ছে। তার অবস্থা একেবারে নওমুসলিমের মত হয়ে পড়েছে, যে ঈমান আনার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তাকে বড় পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। আজ জীবনে প্রথমবার পথভ্রষ্ট উরখানকে তার মেয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। তাকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ। আর আজই কুদরত তার কাছ থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে বদ্ধপরিকর।

মেজর উরখান জানত যে, ফয়জানকে ধরিয়ে দিতে পারলে তাকে যে কোন বড় ধরনের পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হতে পারে। ইতিপূর্বেও একমাত্র সে-ই ফয়জানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই এখন যদি দ্বিতীয়বার সে তাকে ধরিয়ে দিতে পারে, তাহলে এটা কোন অসম্ভব নয় যে, তাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সে জাগতিক মোহে লিপ্ত হয়ে যদি এই কাজটি করে বসে, তাহলে তার বিবেকের কাছে তার কি জবাব দেবে! তার মুসলমান হওয়ার কারণেও তো দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ তায়ালাই তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। সে তার ইসলামী দায়িত্বই পালন করতে বদ্ধপরিকর হল।

"ফয়জান বেটা আমার! সরকারী সেনাবাহিনী হয়ত বুঝে ফেলেছে যে, তুমি এই এলাকায় কোথাও লুকিয়ে রয়েছ। তোমার অবস্থাও এমন নয় যে, তুমি দৌড়ে কোথাও পালাতে পার। এই বসতিতে তোমার জন্য যদি কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে, থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে এই ঘর। যেখানে তুমি বসে আছ। বেটা! তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পারো। এটা আফগান সেনাবাহিনীর একজন মেজরের নয়; বরং আল্লাহ্‌র উপর অটল বিশ্বাসী একজন মুসলমানের ওয়াদা।"

মেজর উরখান ঘরে ঢুকেই ফয়জানকে লক্ষ্য করে বলল।

ফয়জান তার কথার কোন জবাব দিল না। শুধু এক লহমার জন্য ইয়াসমীনের দিকে তাকাল, যার চেহারায় এক রং আসছিল, অন্য রং যাচ্ছিল।

"ফয়জান! তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার।" ইয়াসমীনের কণ্ঠে দৃঢ় আস্থা। ফয়জান কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কি যেন ভাবল। সামরিক ট্রাক ও ট্যাংকগুলোর গড়গড় শব্দ এখন খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শূন্যে হেলিকপ্টারের আওয়াজও ভেসে আসছে, ক্রমেক্রমে সেটা নিকটবর্তী হচ্ছে। ফয়জানের অন্তর পিতা-পুত্রীর অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা নত করল।

উরখান নিজের রিভলবারটা ফয়জানের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং গুলীর পেটী তার হাতে দিয়ে বলল, "বেটা, খোদা না করুন, যদি কোন মারাত্মক পরিস্থিতি এসে পড়ে, তাহলে তুমি নিজেকে একা ভেবো না, আমরাও তোমার সঙ্গে রয়েছি। আমাদের কাছে আরো দুটি রিভলবার রয়েছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।"

ফয়জান উগ্‌লুকে তারা ষ্টোরে লুকিয়ে ফেলল। কয়েক মিনিট পরই রুশ ও আফগান সেনার কয়েকটি প্লাটুন পুরো অভিজাত বসতিটিকে ঘেরাও করে ফেলল। তারা কারো পরোয়া না করে বিভিন্ন ঘরে ঢুকে জোরদার তল্লাশী নিচ্ছিল। সেনা ভর্তি একটা ট্রাক মেজর উরখানের এপার্টমেন্টের গেইটের কাছে এসে থেমে গেল।

ট্রাকে বসা ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় একজন আফগান মেজর ও তার সহযোগী সেপাইগণ। তারা যদিও কেজিবি'র নির্দেশে এসেছে। তাদের মিশন হচ্ছে ফয়জান উগ্‌লুকে গ্রেফতার করা। মেজর গাড়ী থেকে নেমে কলিং বেল টিপলে মেজর উরখান ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হতচকিত সেনা অফিসারটি মেজর উরখানের সঙ্গে করমর্দন করল। তাকে ফয়জানের পালানোর সংবাদ জানাল। উরখানের নিজের অভিনয়ের যোগ্যতার উপর কোন সময়ই আস্থা ছিল না। কিন্তু আজ সে নিজে নিজেকে বাহবা না দিয়ে পারলো না। তার অভিনয় খুবই চমৎকার ও নিখুঁত হল। উরখান সংবাদ শোনা মাত্রই তার চেহারাখানা ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

উরখানের মানসিক অবস্থা সেই আফগান মেজর উপলব্ধি করতে পারল। সে জানত, উরখান কতটুকু নিজের জানের ঝুঁকি নিয়ে ফয়জান উগ্‌লুকে গ্রেফতার করেছিল। এখন ফয়জান উগ্‌লুর পালানোর পর নিঃসন্দেহে তার জানেরও নিরাপত্তা নেই। যে লোক আখন্দজাদাকে লোক সম্মুখে গুলী করে হত্যা করতে পারে, তার পক্ষে উরখানকেও মেরা ফেলা কোন ব্যাপারই নয় এবং সে প্রতিশোধ নিতেও পারে।

অনুসন্ধানে ব্যস্ত রুশ ও আফগান্ সেনারা উরখানের ঘরের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে; কিন্তু কারো পক্ষে ঘরে ঢুকার হিম্মত হল না। প্রায় ঘন্টাখানিক সেনারা বিভিন্ন বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তাদের মিশন অকৃতকার্য হল।

কর্ণেল শোলোখোভ রাগে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। ফয়জান এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা খোদ তার জীবনের জন্যও হুমকি। মুজাহিদদের তুলনায় রাশিয়ান অফিসার্সের ভয়টাই বেশী। কেজিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংবাদটা উপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছাল এবং নিজের ভাগ্যের পরিণতি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল।

।। ৬ ।।

মেজর উরখান ফয়জান উগ্‌লুকে জোর করে ছয়-সাতদিন নিজের মেহমান হিসেবে রাখল, যেন তার আঘাতগুলো সেরে ওঠে। এ কয়টা দিন ইয়াসমীন তার সেবা শুশ্রূষায় দিন-রাত একাকার করে ফেলল। বাপ-বেটী দুজনেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তার পরিচর্যা করল। এভাবে একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে সে মোল্লা মীরদাদ খানের ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। মীরদাদ খান পর্যন্ত পৌঁছতে তার তেমন বেগ পেতে হল না।

কোন এক সময় ইয়াসমীনের কথা মনে হলে তার চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হত, আজ সেই ইয়াসমীনই তার জন্য মানসিক শান্তির

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফয়জান ইয়াসমীনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন অনুভব করতে পারছে।

সে বুঝতে পারলো, সকালের পথ ভোলা ইয়াসমীন সাঁঝের আঁধার ঘনীভূত হওয়ার আগেই নীড়ে ফিরে এসেছে। তার মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি স্পষ্ট স্থিরতা দেখা যাচ্ছে। তার সেই মুসলিম ঐতিহ্যবাহী রমণীয় শরম ও লজ্জাবোধ, যা তথাকথিত প্রগতিবাদ তার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল আবার তার মধ্যে পূর্ণ রূপে বিরাজ করছে। এখন সে একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়েছে। ইয়াসমীনের কাছেও ফয়জানের মর্যাদা একজন মুজাহিদের, যে দ্বীন ইসলাম, দেশের স্বাধীনতা ও আফগানদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যে জানে না, তার এই সংগ্রাম ও জেহাদের শেষ পরিণতি কি দাঁড়াবে!

অসুস্থতার দিনগুলোতে মেজর উরখান তাকে "খাদ"-এর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করল। সে ফয়জানকে এটাও বলেছে, কিভাবে সে কর্ণেল শোলোখোভকে প্রতারিত করে অনুসন্ধান ও তল্লাশী অভিযানকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

।। ৭ ।।

যখন সে দিন ফয়জান অতিপ্রত্যুষে ইয়াসমীন ও তার বাবার কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইল, তখন ইয়াসমীনের হৃদয়টা একদম উদাস হয়ে গেল। ফয়জান তাকে তার সামনের গন্তব্যস্থলের কথা বলল না। তবে তাকে ওয়াদা দিল যে, আবার তাদের বাড়ীতে আসবে। সে মেজর উরখানকেও ইশারা-ইংগিতে বুঝিয়ে দিল যে, সে যেন তাকে পর না ভাবে; তাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতই মনে করে।

উরখানের জন্য এটা অত্যন্ত সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যে, ফয়জান উগ্‌লুর মত একজন মরণজয়ী মুজাহিদ ইয়াসমীনের স্বামী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

মোল্লা মীরদাদ খান ও অন্যান্য মুজাহিদরা শলা-পরামর্শের পর সাময়িকভাবে ফয়জান উগ্‌লুকে রাজধানী কাবুল হতে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ফয়সালা করলেন। তারা জানেন, কেজিবি ও খাদ পাগলা কুকুরের মত ফয়জানকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কাবুলে তাদের জন্য নিরাপদ ঠিকানা নেই।

বিভিন্ন দূর্গম পথ অতিক্রম করে ফয়জান উগ্‌লু অবশেষে মুজাহিদদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ঠিকানা জালালাবাদে এসে পৌঁছল। এখানে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই জেহাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টা জোরদার করা হল। জালালাবাদের মুজাহিদরা তাকে স্থানীয় কমান্ডার হিসেবে মর্যাদা দান করল। তার জালালাবাদে উপস্থিতি ও বিভিন্ন সফল অপারেশনের কথা শুনে কেজিবির বর্বর প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগল। খাদ ও কেজিবির সদস্যরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

মস্কোয় কেজিবির কেন্দ্রীয় কমান্ড ফয়জান উগ্‌লুর ব্যাপারটি স্বয়ং হ্যান্ডেল করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে আসল যে, এ ব্যাপারে তাদের পুরনো বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতা নেওয়া উচিত।

ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ ইতিপূর্বেও আফগানিস্তানে কয়েকটি মিশনে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল। কেজিবির মত ভারতেরও আফগানিস্তানে এজেন্ট ও গোয়েন্দা রয়েছে। এর কিছু দিন পরই রাশিয়ার একটি "বিশেষ মিশন" নিয়ে একটি রুশ মিগ বিমান মস্কো থেকে দিল্লীর পথে আকাশে উড়ল।

ফাঁদ

রুশ মিগ বিমানের প্রচন্ড শব্দে পালামপুরের নিরবতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। যেই মাত্র বিমানটি রাডারের রেঞ্জের আওতায় আসল, পালামপুরের A. T. C (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) সজাগ হয়ে গেল। কর্নেল শুনীল দত্ত খোদ নিজেই কন্ট্রোল রুমে বসে সমস্ত বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছিলেন। সে সময় রাত হয়েছিল ১১টা। এয়ার বেসের ইমারতগুলিতে কর্তব্যরত গার্ডদের টহলের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাচ্ছিল না। কর্ণেল শুনীলের সামনে রাখা ট্রান্সমিটার হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠল। তিনি তার হাতের কফির মগটি একদিকে রেখে সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দিলেন।

"আমি শুনীল বলছি কন্ট্রোল রুম থেকে।"

"স্যার! রেড স্কোয়ার প্রবেশ করেছে।"

"নো কানেক্ট, ডেড আউট।"

(ঠিক আছে। আগামী নির্দেশ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।") আর্মি গোয়েন্দা বিভাগের দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারও সেই রুমের এক কোণে বসা ছিল। তারা ওঠে কর্ণেলের কাছে এল।

"রেড স্কোয়ার পৌঁছে গেছে, রেড স্কোয়ার পৌঁছে গেছে, পালামপুর এয়ারবেস সতর্ক হয়ে যাও, সতর্ক হয়ে যাও, ওভার।" জেটবিমান থেকে বার্তাটি ভেসে আসছে।

"রেড স্কোয়ার! পালামপুর পূর্ণ সতর্ক রয়েছে, নিশ্চিন্ত থাকুন।" কর্ণেল সুনীল মাইক মুখের কাছে নিয়ে বললেন। এরই মধ্যে সেই দুজন আর্মি গোয়েন্দা অফিসারের একজন, যিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেনের উর্দি পরে আছেন, বড় স্ক্রীনের সামনে মাইক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যার মধ্যে বিভিন্ন লহর উত্থিত হয়ে আবার গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

"পালামপুর এয়ার বেসের পরিচালকগণ! ওভার।" জেট থেকে বার্তা আসল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাইক মুখের সামনে নিয়ে বলে উঠলেন, "রেড স্কোয়ার! নর্থ, ৪৫ ডিগ্রী, ওভার।"

"ইয়েস, পালামপুর, ওভার।"

এখন কন্ট্রোল রুমের বড় তরঙ্গগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"রেড স্কোয়ার! ৭০ ডিগ্রী, ইস্ট, ওভার।"

"আমি এয়ার বেসের বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি, ওভার।" জেট থেকে উত্তর এলো।

"রেড স্কোয়ার! ৫০ ডিগ্রী উত্তরে এসো এবং নামার জন্য প্রস্তুতি নাও, ওভার।"

"ওকে পালামপুর, ওভার।"

স্ক্রীনে এখন শুধু একটি তরঙ্গ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে, যা খুবই দ্রুত গতিতে চলছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ দ্রুত ভেসে আসতে লাগল ঃ

"পালামপুর! প্রস্তুত থাক, প্লিজ, ফিফটি, ফোরটি, থারটি, টুয়েনটি, টেন, জিরো।"

"ল্যাণ্ড করুন।" গ্রুপ ক্যাপ্টেন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দ্রুত চলমান লহরটির দিকে।

অন্য দিকে কর্ণেল সুনীল দত্ত আর তার দ্বিতীয় মেজর সঙ্গী চোখে দূরবীন লাগিয়ে রানওয়ের জ্বলন্ত নেভানো বাতিগুলো দেখছেন। বিকট চেহারার জেট বিমানটির গর্জন স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই জাহাজটি পরিষ্কার দেখা গেল।

"রেড স্কোয়ার! তুমি ঠিকমতই আসছ। টেক্সী ট্রেক নাম্বার-৫

তোমাদের সামনে রয়েছে, ওভার।" গ্রুপ ক্যাপ্টেন বললেন।

"ল্যান্ড করলাম, পালামপুর! উভার" জাহাজ থেকে উত্তর এল। ধন্যবাদ! ঈশ্বর সহায় হোন, আউট।" গ্রুপ ক্যাপ্টেন নিজের মাথার সঙ্গে পেঁচানো মাইকটি নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

"ক্যাপ্টেন! সহযোগিতার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি হাই কমান্ডের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করছ।" কর্ণেল সুনীল গ্রুপ ক্যাপ্টেনের সাথে করমর্দন করে বের হতে হতে কথাগুলো বলল। তারা দুজনে প্রথম থেকে তাদের জন্য দাঁড়ানো একটি কারে চড়ল। কারটি খুব দ্রুত গতিতে জেট বিমান অভিমুখে দৌড়াল। জেট বিমান রানওয়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইঞ্জিনে এখনো স্ট্রার্ট রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে ইঞ্জিনটি বন্ধ হয়ে গেল। কেজিবির বিশেষ নির্দেশ ছিল যেন বিমানের কাছে কোন গাড়ী কিংবা এয়ারপোর্টের কোন কর্মী না আসে। সে জন্য কর্ণেল সুনীল ও তার সঙ্গী ক্যাপ্টেন বিমানের কাছাকাছি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে কারো জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাদামী রঙের পোশাক পরা একজন রাশিয়ানকে তাদের দিকে আসতে দেখা গেল। সে জাহাজের ককপিট থেকেই নেমে এসেছে। তার হাতে একটি ব্রিফকেস। না জানি তার চেহারার মধ্যে কি লেখা ছিল, সে কর্ণের সুনীল ও ক্যাপ্টেনের কাছে পৌছামাত্র তাদের হাতগুলো স্যালুটের জন্য আপনা আপনি উপরে ওঠে গেল।

"কর্ণেল! জাহাজটাকে এখখুনি লোক চক্ষুর আঁড়ালে রাখার ব্যবস্থা কর।" রুশ অফিসার এসেই তাদেরকে নির্দেশ দিল।

"ওকে স্যার!" বলে কর্নেল কার-এর দরজাটি খুলে তাতে ফিট করা ট্রান্সমিটার দিয়ে কাউকে কি যেন নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ইঞ্জিন ফের জেগে উঠল। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজটাকে গোপন জায়গায় ল্যান্ড করা না হল, রাশিয়ানটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এয়ারপোর্টে বিদ্যমান এয়ারফোর্স প্রভোস্ট গার্ডরা পুরো এলাকাটিকে ঘেরাও করে রেখেছে। জাহাজের পাইলট জাহাজেই বসে আছে, যেন কোন ইন্ডিয়ান অফিসার জাহাজটি চেক করতে না

পারে। খানিক পরেই তারা তিনজন কর্ণেল সুনীলের দ্রুতগামী কারে করে এয়াপোর্ট থেকে বাইরে বের হল। কেজিবির অফিসার ব্রিফকেসটি হাতের কব্জিতে বাঁধা একটি চেইনের সাথে লক করে রেখেছে।

।। ২ ।।

ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর হেড কোয়ার্টারে জেনারেল মেহতা অধীর চিত্তে একজনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আজ সকাল থেকেই অফিসে উপস্থিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ নির্দেশে তাকে বলা হয়েছে যেন, রাশিয়া থেকে আগত একজন অতিথীর সঙ্গে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু কি ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে তিনি জানেন না। ফরেন অফিসও সে ব্যাপারে কিছুই জানে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে শুধু এতটুকু বলেছিলেন যে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একান্ত গোপনীয় বিষয়। তবে এর চেয়ে বেশী তিনিও কিছু জানেন না। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন সার্বিক হেল্প করার জন্য, ব্যস্ এতটুকু। এর চেয়ে বেশী আর কেউ কিছু জানে না। যাহোক খানিক পরেই লাল-সাদা বর্ণের একজন দীর্ঘদেহী রুশ জেনারেলকে দেখা গেল। জেনারেল মেহতা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, যিনি রুশ জেট বিমান থেকে নেমে একটি বুলেট প্রুফ কারে চড়ে এখানে এসেছেন।

জেনারেল ইভানোচ তুর্গনেভ জেনারেল মেহতার প্রতি শীতল দৃষ্টি হেনে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন করার জন্য। জেনারেল মেহতা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন, তার সামনে দন্ডায়মান ব্যক্তিটি হচ্ছেন কেজিবির ডেপুটি ডাইরেক্টর।

জেনারেল মেহতা তাকে তার বিশেষ রুমে নিয়ে গেলেন। তিনি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যে মানসিক টেনশনে ভুগছিলেন, এখন অনেকটা তা থেকে বেরিয়ে নিজেকে চাপমুক্ত বলে মনে হল। তার ইচ্ছে আগামী সকাল থেকে জেনারেলের সঙ্গে আলাপ হোক। এটা চিন্তা করেই তিনি এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে রুশ জেনারেলকে বললেন ঃ

"জেনারেল! আমার মনে হয়, আপনি এখন বিশ্রাম নিন, সকালে আমরা আলোচনায় মিলিত হব।"

এখনো পর্যন্ত রুশ জেনারেল বসার প্রতি কোন ধ্যানই দেননি। তিনি মেহতার প্রস্তাবে অপ্রত্যাশিতভাবে জবাব দিলেন ঃ

"জেনারেল! আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, তার সামনে রাত-দিন, আরাম-বিশ্রাম একেবারে গুরুত্বহীন। আসুন সবকিছুর আগে মতলবের কথা বলি!" এ বলে তিনি জেনারেল মেহতার টেবিলের সামনে রাখা একটি আরামদায়ক কুরসীতে বসে পড়লেন।

"ঠিক আছে, আপনার কথাই রাইট।" মেহতা শ্রান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন। তিনি তার সেক্রেটারীকে ফোন করে কফি প্রস্তুত করতে বললেন।

জেনারেল মেহতা বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন; কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে জেনারেল তুর্গেনিভের কথা মানতে হচ্ছে। কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কড়াভাবে তাকে নির্দেশ দিয়েছে। যেন রুশ জেনারেলের সাথে সব ধরনের সহযোগিত করা হয়। জেনারেল তুর্গেনিভ নিজের হাতের কব্জির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ব্রিফকেসটি এখন হাত থেকে মুক্ত করে টেবিলের উপর রাখলেন। ইতোমধ্যে কফি প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ এল। জেনারেল মেহতা নিজে ওঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি একটি ট্রে হাতে রুমে ঢুকলেন, যাতে গরম গরম দুই মগ কফি রাখা আছে।

।। ৩ ।।

কয়েক মিনিট পর তাদের উভয়ের দৃষ্টি একটি বিশেষ ফাইলের উপর নিবদ্ধ হল। জেনারেল তুর্গেনিভ জেনারেল মেহতার সামনে ফাইলটি মেলে ধরে বললেন ঃ

"জেনারেল! এই ব্যক্তিটিকে দেখতে পাচ্ছেন? আমাদের তথ্য অনুযায়ী এই ব্যক্তিটি হানাজার কাছাকাছি এলাকা খালদাবাদ কিংবা

চাল্‌তে অবস্থান করছে। তবে জালালাবাদেই তার আনাগুনা বেশী। বিদ্রোহী গেরিলাদের একটি শক্তিশালী গ্রুপের সে কমান্ড করছে। তাকে খতম করে দিতে পারলে বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী দল আপসেই নিস্ক্রীয় হয়ে যাবে। আপনাদের লোক দিয়েই তাকে খতম করতে হবে।"

জেনারেল তুর্গেনিভ ফাইলের উপর থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে জেনারেল মেহতার দিকে দেখলেন, যিনি এখনো সেই ব্যক্তিটির অবয়বের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। পঁচিশ বছরের একটি হাট্টাগোট্টা পূর্ণ যুবক, শক্ত দেহের পাঠান। গলায় ঝুলছে একটি দূরবীন এবং হাতে রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল ক্লাশিনকোভ। তার মাথায় পাঠানী পাকোল টুপি।

"যুবকটির নাম কি?"

"ফয়জান–ফয়জান উগ্‌লু! তবে এ নামটি যে তার, তাও নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কারণ, মুজাহিদ গেরিলারা কৌশল হিসেবে নিজেদের জন্য একাধিক নাম ব্যবহার করে। তবে সে বেশীর ভাগ এ নামটিই ব্যবহার করে।" খানিকের জন্য থেমে তিনি মেহতার চোখে চোখ রাখলেন। তারপর বললেন, "এ ব্যাপারে আপনাকে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, জালালাবাদ ও কাবুলে অনেক ইন্ডিয়ান হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে। তাদের কারোর দিয়ে একাজটি সমাধা করাই সমীচীন হবে। আপনাকে এ বিষয়টিও অবহিত করাতে চাই যে, ইতিপূর্বে তাকে খতম করার জন্য দশ সদস্যের একটি কমান্ডো গ্রুপকে পাঠানো হয়েছিল। গ্রুপটির কমান্ড করছিল একজন আফগান মেজর। তারা সবাই ছিল কেজিবি'র উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত; কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তাদের কারো লাশ আমরা খুঁজে পাইনি এবং আমরা এও জানতে পারিনি তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। অথচ তারা সবাই ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। জি, আর, ইউ-এর প্রশিক্ষণও তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর সব ধরনের ইকুইপ্‌মেন্ট ছিল। তবুও

বুঝতে পারলাম না, তাদেরকে মাটি গিলে ফেলল, না আসমান উঠিয়ে নিল!” তুর্গেনিভ সিগারেটের ধুঁয়া শূন্যে ছুড়ে কথাগুলো বললেন।

“এ ব্যাপারে আপনাদের কি কোন পরিকল্পনা আছে?” জেনারেল মেহতা এসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, আমাদের পরিকল্পনা হল, ধোঁকা দিয়ে তার উপর অতর্কিত হামলা করা। আমাদের গোয়েন্দা কমান্ডোরা তার পিছনে লেগে আছে। তার একটা দুর্বল দিক আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।”

“সেটা কী?” মেহতা অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“সে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক সময় কাবুল ও জালালাবাদ আসা-যাওয়া করে। শহরে যে সব অপারেশন চালানো হয় তার বেশীরভাগ সে-ই ম্যানেজ করে। সে মস্কো ইউনির্ভাসিটিতে পড়াশুনা করেছে; কিন্তু করলে কি হবে, আধুনিক কালচারকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে।”

“আমি তাকে দেখে নেব।” জেনারেল মেহতা দৃঢ়তার সাথে বললেন।

“জেনারেল! আমার ধারণা, আপনি এ মিশণের গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ অবগত আছেন। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ যেন এ সম্বন্ধে ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে না পারে।” জেনারেল তুর্গেনিভের কণ্ঠটা এমন মনে হল, যেন তিনি তার কোন অধীনস্তের সঙ্গে কথা বলছেন।

“আমার কি কর্তব্য রয়েছে সে ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সজাগ রয়েছি জেনারেল! তবে আমাদেরও কিছু নিয়মনীতি রয়েছে, যে ব্যাপারে আপনার কাছে বলার কিছু নেই।”

জেনারেল মেহতা কথাগুলো হেসেই বললেন। কিন্তু তার কণ্ঠের তিক্ততা কেজিবির মুখপাত্র এই জেনারেলও অনুধাবন করতে ভুল করলেন না।

“ওকে জেনারেল! গুড্‌লাক। আগামীতে সাফল্যের উৎসব এক

সঙ্গেই আমরা পালন করব। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।” জেনারেল তুর্গেনিভের ঠোঁটের কপট হাসিটি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

।। ৪ ।।

কিছুক্ষণ পরই তিনি গোপন স্থানে রাখা জেট বিমানটির দিকে ফিরে গেলেন। এই বিমানটিকে মিগ-এর আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে। এ ধরনের বিমান হচ্ছে রুশ বিমানবাহিনীর সবচেয়ে মারাত্মক ও ডেঞ্জার জেট, যে সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কেউ জানে না। এসব বিমান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। একমাত্র কেজিবির বিশেষ কমান্ডো ও অফিসারদের জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। রেড আর্মি এবং রেড এয়ার ফোর্সদের এখনো এসব প্লেন দেওয়া হয়নি।

কর্ণেল সুনীল তাকে এয়ার পোর্টে ছাড়তে এসেছেন। এ সময় ভোর তিনটা বাজছে। তিনি সমস্ত রাত নিজের কামরায় বসে ঝিমুচ্ছিলেন। এখানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকজন “বিশেষ নির্দেশ” অনুযায়ী খুবই ডিসপ্লিন শো করছে। কর্ণেল সুনীলকে ডিউটি দেওয়া হয়েছে, যেন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের কোন সদস্য এই বিশেষ বিমানটির কাছে ঘেঁষতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে। তাকে এই “বাজে ডিউটি” দেওয়াতে কর্তৃপক্ষের উপর তার ভীষন রাগ হচ্ছে। কারণ, এ কাজটি তো একজন মামুলী সেপাইও সম্পাদন করতে পারে; কিন্তু, অতিসত্বর সে বুঝতে পারল, বিষয়টি সত্যিই অসাধারণ ও স্পর্শকাতর, যে কারণে তাকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

।। ৫ ।।

বিমলদাস কাবুল নগরীর ধনাঢ্য এক কোটিপতি। দেশ বিভাগের আগে তার ব্যবসা পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু

দেশ ভাগ হয়ে গেলে কাবুল থেকে জালালাবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইন্ডিয়ান সরকারের কাছেও তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারণ দেশ বিভাগের পরপরই তাকে ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা বিভাগ নিজেদের এজেন্ট বানিয়ে নেবার ব্যাপারে সফল হয়। বিমল দাসেরই বদৌলতে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ আফগান রাজধানী কাবুলে পা জমাতে সক্ষম হয়। সে ছিল ইন্ডিয়ার একজন উচ্চভিলাষী এজেন্ট। তার দূরদর্শী চক্ষু দেখতে পাচ্ছিল, তাদেরই অন্যতম এজেন্ট সীমান্ত গান্ধী (খান আব্দুল গাফফার খান) এর হীন পরিকল্পনা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলমানদের প্রচেষ্টার ফলে ব্যর্থ হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত পাক-আফগান সীমান্তের উভয় দিকে এমন কিছু বিপথগামী মুসলিম নামধারী কপট প্রকৃতির পাঠান রয়েছে, যাদের দ্বীন ঈমানকে কিনে ফেলা একেবারে সহজ এবং তাদের মাধ্যমে তাদের সেই অখন্ড মহাভারতের অলীক স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা যেতে পারে, যে মহাভারতের স্বপ্ন ও আক্ষেপ অন্তরে নিয়ে কংগ্রেস ও হিন্দুত্ববাদী অন্যান্য সংগঠনের বড় বড় নেতারা অকালে পরকালে পাড়ি জমিয়েছে। একজন হিন্দু হিসেবে বিমল দাসের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করত। কারণ বিশেষ করে হিন্দুস্তান বিভক্তির ফলে তাদের সেই অখন্ড ভারত চিন্তাধারায় কেবল ক্ষতি হয়নি; তার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচুর লোকসান হয়েছে। এখন কমপক্ষে পাকিস্তানী সীমানার কাছে সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে তারা সক্ষম নয়।

সে অন্যান্য হিন্দুর মত নিজেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে নিজের জন্য একটা মহা চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিয়েছে। পাকিস্তানের নামে উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির উত্থানকে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে নারাজ। অতএব এখন মহা সুযোগ পাওয়া গেল। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতার মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলিম শক্তি ও চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার এখনই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। এখন বিমল দাস তার মনের জিঘাংসা চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। বিমল যদিও বয়সের দিক

থেকে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু দেহে বুড়ো হওয়ার কোন আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি। কারণ শরীরকে ঠিক রাখার জন্য সে অনেক পয়সা খরচ করে। তার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল কী ভাবে এই অঞ্চলের মুসলিম জাতিকে সমূলে বিনাশ করা যায়। কাবুলে ভারতীয় কোন রাষ্ট্রদূত এলে সর্বপ্রথম বিমল দাসের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করতেন। দিল্লীতেও রয়েছে তার অঢেল সহায় সম্পত্তি। নিজের দুই ছেলে ও এক মেয়েকে দিল্লীতেই রেখেছে। কাবুলেও তার আরো দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। সেজন্য সে কখনো কাবুলে, আবার কখনো দিল্লীতে থাকে। কাবুল ও জালালাবাদ ছাড়াও আফগানিস্তানের প্রায় প্রতিটি বড় শহরে তার রয়েছে আড়ত। আফগানিস্তানে তার ছেলে দুটো ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা চালায়। তাদের ট্রাকগুলো কাবুল থেকে নিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত চলাচল করে। সেই বিমল দাস বর্তমানে দিল্লীতে অবস্থান করছে।

।। ৬ ।।

সে দিন সকাল সকাল যেই-মাত্র সে মন্দির থেকে পূজা-পাঠ শেষ করে ঘরে ফিরল তখনই তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা অপেক্ষা করছিল। বার্তাটি ছিল বন্ধুর। বার্তা পেয়ে দেরী না করে তৎক্ষণাৎ সে সফদর জং রোডের দিকে রওনা দিল। সেখানে পুরনো বন্ধু কর্ণেল সুনীল দাস তার জন্য অপেক্ষা করছে। সফদর জং রোড নতুন দিল্লীর এমন একটি এলাকায় অবস্থিত যেখানে বেশীর ভাগ সরকারী অফিস রয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিশাল বিশাল বিলাসবহুল বাংলোও এখানেই অবস্থিত। এখানেই একটি অফিস রয়েছে যাতে "সমাজ কল্যাণ অফিস" লেখা একটি সাইন বোর্ড লাগানো রয়েছে। এটা মূলত ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা বিভাগ "র"-এর অফিস। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত হয়ে একটি শক্তিশালী কমান্ডের নেতৃত্বে কাজ করে। এই সমাজকল্যাণ অফিসে তাদেরই আনাগোনা ছিল, যারা কোন না কোনভাবে "র"-এর সাথে জড়িত ছিল। তাদেরকে এখানে 'মেহমান বা অতিথি' বলা

হয়। তাদের প্রত্যেকে বিদেশে গুপ্তচরবৃত্তি করে। এখানে এমন সিস্টেম করে রাখা যে, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের চেহারা দেখবে এমন কোন কায়দাই নেই।

বিমল দাস যখন সেই বিশেষ রুমটিতে প্রবেশ করল, যেখানে সে গত বিশ বছর ধরে আসা-যাওয়া করে, তখন সে তার গত তিন বছরের বন্ধু সুনীল দাসকে দেখতে পেল, যে খুবই অধীর চিত্তে তার অপেক্ষায় বসা ছিল। ইতিপূর্বে এমন কখনো দেখা যায়নি। বিমল দাসের দূরদৃষ্টি আর কপট চোখ কর্ণেল সুনীলের চেহারা দেখামাত্রই বুঝতে পারল, অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার-স্যাপার আছে।

কর্ণেল সুনীল নিয়ম অনুযায়ী খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল বিমলকে। তার জন্য কফি আনাল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক লক্ষ্যহীন কিছু কথাবার্তা বলল। কিন্তু দ্রুত সে তার আসল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হল। সে খুটে খুটে বিমলদাসের কাছে জালালাবাদ, কাবুল ও তার আশে-পাশের অঞ্চলের টাটকা খবর জিজ্ঞেস করল। খানিকপর যখন কর্নেল সুনীল তার সামনে একটি ছবি রাখল, তা দেখে বিমল দাসের অন্তরটা হঠাৎ করেই কেঁপে উঠল। কিন্তু নিজের কোন ভাব-ভঙ্গি দ্বারা সে তার অস্থির ভাবকে প্রকাশ করতে দিল না। সে তো আসলে একজন ঝাঁনু এজেন্ট। কাজেই এটা তার কাছে কোন ব্যাপার না।

"বিমল! এই যুবকটাকে তুমি কি চেন?"

বিমলতো তাকে ভালো করেই চিনে। ফয়জান সম্পর্ক জানে না এমন কে আছে! কিন্তু সে না চেনার ভান করল।

"না মহারাজ, আমি তো তাকে পুরোপুরি চিনি না, তবে একটু-আধটু তার সম্পর্কে শুনেছি।" বিমল তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কপটতার আশ্রয় নিয়ে বলল।

"যে করে হোক, তাকে চেনার চেষ্টা কর। বিমল! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হত্যা করতে হবে এবং এ কাজটি তোমাকেই করতে

হবে। অবশ্যই করতে হবে। "মাষ্টার"-এর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ এসেছে।"

কর্নেল সুনীল তার শান্ত চোখ দিয়ে বিমল দাসের হাবভাব গভীর ভাবে লক্ষ্য করছে। সে তার চেহারায় তার কথার প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করছে; কিন্তু বিমলের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে তার চেহারায় কোন ধরনের পেরেশানী প্রকাশ হতে দিল না। কারণ সে তার ক্রীড়ার সব কলাকৌশল ভালভাবেই জানে।

"ঠিক আছে মহারাজ! প্রথমতো খোঁজ করতে হবে যে, সে কে?" সে কর্নেল সুনীলকে আশ্বস্ত করে বলল।

"বিমল! কাবুলে আমাদের "লাল বন্ধুরা" রয়েছে। তুমি তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করবে, আপাতত এটাই তোমার ডিউটি।" কর্নেল সুনীল তাকে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে কথা শেষ করল।

।। ৭ ।।

যখন বিমলদাস সফদর জং রোড থেকে তার "কানাট প্যালেস" -এ আসছিল, তখন সে কল্পনাও করতে পারেনি যে, একজন মোটর সাইকেল আরোহী তার বাড়ি থেকে "র"-এর অফিস পর্যন্ত তার পিছু নিয়েছে। তারপর সেই মোটর আরোহী সেই অফিস থেকে তার ঘর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে থাকে। ব্যাপারটা বিমলদাস মোটেই আঁচ করতে পারেনি। এরপর মোটর সাইকেল আরোহী অন্য একটি সড়ক ধরে কোথাও উধাও হয়ে গেল। এখন তার গন্তব্যস্থল হল দিল্লীর একটি সাধারণ আবাসিক হোটেল। এই নওজোয়ানটি সকাল থেকেই হুণ্ডা নিয়ে বিমলদাসের পিছনে লেগে আছে। বিমলদাসের প্রতিটি গতিবিধি সে গভীরভাবে নোট করেছে। সে বিমল দাসকে তার গৃহ থেকে "সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার"-এর দফতর পর্যন্ত যেতে আসতে দেখল। সে ভালকরেই জানে, এই সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার আসলে কী জিনিস এবং সেখানে কোন্ ধরনের লোকদের আনাগোনা!

।। ৮ ।।

দোস্ত আভোর খান হচ্ছে বাইশ (২২) বছরের একজন যুবক। সে এর পূর্বে কয়েকবার ইন্ডিয়া এসেছে। তার বাবা ফলের ব্যবসায়ী। তার বাবা তাকে এইচ. এস. সি পাশ করার কিছুদিন পর দিল্লীরই একটি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আভোর খান সেই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা করে। তার বাবা কোন সময়ই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি এবং পলিটিক্যাল ব্যাপারে আলোচনা করাটাও তিনি সমীচীন মনে করতেন না। তিনি ধর্ম-কর্মকেও পছন্দ করতেন না। আমেরিকান এবং ইউরোপীয় কালচারকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তার ইচ্ছা ছিল, আভোর খান ভালভাবে পড়াশুনা করে পাশ্চাত্যের আদর্শ ও শিক্ষা অর্জন করবে এবং ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন পার্টিতে যোগদান করে সরকারের কোন উচ্চপদস্থ অফিসার হবে। তিনি চাইতেন না, দোস্ত আভোর খান ধর্ম প্রিয় হোক। তিনি ধর্ম-কর্মকে অহেতুক ও বেকুব লোকদের কাজ মনে করতেন।

কিন্তু দোস্ত আভোর খান হল তার বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ইসলামের অনুশাসনকে মনে প্রাণে ভালবাসে এবং ধর্ম-কর্ম করাকে ইহলৌলিক ও পারলৌকিক সফলতার আসল বাহন মনে করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার সাথে তার বাবার মতের কোন মিল নেই। তার বাবার দৃষ্টিভঙ্গি হল, যুগ ও সময়ের সাথে আপোষ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বর্তমান যুগের সভ্যতায় ধর্মের কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই। তাই তাকে জলাঞ্জলী দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি আরো দেখতে পাচ্ছিলেন যে, আফগান বাদশাহ জহীর শাহ রাশিয়াকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিয়েছেন। রাশিয়ার ব্যাপারে তিনি তার মুরুব্বীদের কাছ থেকে শুনেছেন যে, রাশিয়া যে দেশকে সহযোগিতা করে, সে দেশে তারা তাদের কমিউনিজম বিপ্লবও রফতানী করে থাকে; বরং তারা সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই সাহায্য দিয়ে থাকে। শাহী বংশে ধীরে ধীরে সে সকল লোক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছিল যারা রাশিয়ার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এসব লোকের চিন্তাধারা জনগণের নিকট অস্পষ্ট ছিল না।

একদিকে তারা আফগানিস্তানকে আধুনিক করার নামে কমিউনিজমের উপর লেখা লাল বই ও রচনা এবং মস্কো থেকে আমদানীকৃত উলঙ্গ ও নগ্ন ছবি দিয়ে পরিপূর্ণ ম্যাগাজিনসমূহ পুরো আফগানিস্তানের বাজারগুলোতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এভাবে তারা চাচ্ছিল যেন আফগানিস্তানের ভবিষ্যত বংশধর যৌন ক্ষুধায় মেতে ওঠে এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মত আফগানিস্তানকেও ফ্রি সেক্স রাষ্ট্ররূপে রূপান্তরিত করা যায়। অন্যদিকে পখ্‌তুন জাতীয়তাবাদকে রুশ ও ভারতের ইশারায় ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল যেন পাকিস্তানকেও এ যুদ্ধে একটি পক্ষ হিসেবে জড়িয়ে ফেলা যায়।

এসব অবস্থা দেখে দোস্ত আভোর খানের বাবা নিশ্চিতভাবে বুঝে নেন যে, ভবিষ্যতে বাম চিন্তাধারার লোকরাই আফগানিস্তান শাসন করবে। সত্যি সত্যি তিনি একদিন শুনলেন যে, জহীর শাহের ডান হস্ত ও তার আত্মীয় জেনারেল দাউদ খান তার গদি উল্টিয়ে দিয়েছে। ফলে জহীর শাহ তার পরিবার নিয়ে ইটালীতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। যারা রাজ সিংহাসন দখল করে নিয়েছে তাদের চিন্তাধারা কি–এ ব্যাপারে আফগানিস্তানের সুধী মহল ভাল করেই জানে। তাদের ধর্মবিমুখতা ও খোদাদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে কারোরই অজানা ছিল না। দেখতে দেখতে কয়েকমাসের মধ্যে রাশিয়ার হাজার হাজার সেনা সদস্য বিভিন্ন বেশ ধারণ করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে থাকে। এরপর থেকে শুরু হয়ে যায় রাশিয়ার নীল নকশা বাস্তবায়ন। আফগান কুমিউনিষ্ট বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রাশিয়া সেনাকর্মকর্তা পাঠায় উপদেষ্টা রূপে। কিছু দিনের ভিতর আফগানিস্তানে তিন তিনটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ক্ষমতায় আরোহণ করেন রাশিয়ার পরিপূর্ণ দালাল প্রেসিডেন্ট বারবাক কারমাল। আর এই অনুগত দাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য মস্কো নিজেদের দেড় লাখ ফৌজ আফগানিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়।

।। ৯ ।।

দোস্ত আভোর খান প্রেসিডেন্ট দাউদের আমলে কাবুলের একটি কলেজে পড়াশুনা করত। একদিন তার সাক্ষাত হল জুমআ খানের

সাথে। জুমআ খানের ব্যাপারে কলেজে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মোল্লাদের খাছ মানুষ। তার সাথে মোল্লাদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। মোল্লাদের প্রতি দোস্ত আভোর খানের সব সময় দুর্বলতা ছিল। তার মনে এ কথাটি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এই দেশকে যদি কেউ সত্যিকারের মুক্তি দিতে পারে তাহলে তারা হচ্ছেন এই মোল্লা সম্প্রদায়। তারা বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনো মেনে নেবেন না। আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। রুশ দৈত্য যেভাবে নিজের ভয়ানক মুখ খুলে তাদের দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে অতি সত্বর তাদের সকলকে গ্রাস করে ফেলবে। এই শ্বেত ভল্লুকের শির কর্তন করতে পারে একমাত্র এ দেশীয় আলেম-ওলামা ও বুজর্গানে দ্বীন লোকেরা। সত্যিই তারা একদিন রুশ সমর্থিত দালাল ও খোদাদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। তারা আফগান তৌহিদী জনতাকে রাশিয়া ও নাস্তিক সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানালেন। দোস্ত আভোর খানের অনেক পখতুন ছাত্র বন্ধু ওলামায়ে কেরামের "দেশ বাঁচাও, দ্বীন বাঁচাও এবং মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু বাঁচাও" সংগ্রামে যোগ দিতে লাগল।

কলেজের ধর্মপ্রাণ ছাত্ররা গোপনে জেহাদের কাজ করতে লাগল। সেখানে প্রাধান্য ছিল সরকার সমর্থিত নাস্তিক ছাত্র সংগঠন "পরচম" কিংবা "খালকী"দের। তাদের হাতে থাকে সব সময় মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র। সরকার পরিপূর্ণভাবে তাদের সহযোগিতা করে। কোন ছাত্রের ব্যাপারে যদি এই কমিউনিষ্ট ছাত্রদের সন্দেহ হয় যে, তার সাথে মোল্লাদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে তাহলে দেখা যায় যে, কোন একদিন কলেজ থেকে ঘরে ফেরার পথে সেই ছাত্র নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার কোন খোঁজ খবর কেউই পাচ্ছে না। পাঁচ ছয় মাস পর যখন তার লাশ কিংবা গ্রেপ্তারীর কথা জানা যেত তখন দোস্ত আভোর খানের অন্তর থেকে শাহাদত বরণকারীর জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ বেরিয়ে আসত।

কাবুলের আধুনিক শ্রেণী যারা প্রগতিবাদের আঁড়ালে রাশিয়ার নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করার জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেছে, তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন তাদের সন্তানরা তাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করে এবং আধুনিক কালের আধুনিক মতবাদ গ্রহণ করে প্রগতি ও উন্নতির প্রতিযোগিতায় তারাও অংশীদার হয়। কিন্তু কে জানে "মোল্লাদের" কাছে এমন কি মন্ত্র রয়েছে যে, যাদের উপর পড়ে তা ফুৎকার দিচ্ছেন তারা তাদেরই তাবেদার বনে যাচ্ছে!

সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন দুটি গ্রুপ বিরাজ করছে, ঠিক তেমনি কলেজ, ইউনিভার্সিটিতেও দুটি দল রয়েছে। একটি হল রুশ সমর্থক "কমিউনিস্ট গ্রুপ" এবং আরেকটি হচ্ছে "মোল্লা সমর্থক ইসলাম পছন্দ গ্রুপ"। রুশ সমর্থকরা দিবালোকে অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে তাদের প্রোগ্রামসমূহ চালিয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম পছন্দ ছাত্রদের তাদের কার্যক্রম গোপনে আঞ্জাম দিতে হয়। প্রতিটি ছাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, তার সঙ্গী কেজিবি ও খাদের এজেন্ট কিনা।

অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, হঠাৎ করে কলেজ থেকে ঘরে ফেরার পথে কিংবা ঘর থেকে কলেজ যাওয়ার পথে খাদ এর সদস্যরা কোন নওজোয়ানকে জীপে বসিয়ে কোন অজানা স্থানে নিয়ে গেছে । অতঃপর অনেক দিন পর্যন্ত সেই ছাত্রের কোন সংবাদ পাওয়া যেত না।

দোস্ত আভোর খান ও জুমআ খানের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কাবুলের একটি রেষ্টুরেন্টে। জুমআ খানের উপর আস্থা সৃষ্টি হতে তার প্রায় কয়েক মাস লেগে যায়। দোস্ত আভোর খান যখন নিশ্চিত হল যে, সে মুজাহিদ বাহিনীরই লোক, তখন সে তার কাছে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল যে, সে মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করতে চায়। আফগান ইসলামী মিল্লাতের জন্য প্রয়োজনে সে সর্বস্ব কোরবানী করে দেবে। সে জুমআ খানের কাছে আবদার করল যেন তাকে মুজাহিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। জুমআ খান গোপনে মুজাহিদদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দেয়। মুজাহিদরা অনেক চিন্তা ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, তার দ্বারা গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ

করাবেন। মুজাহিদরা দোস্ত আভোর খানকে কাবুলেরই একটি গোপন আস্তানায় প্রশিক্ষণ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই সে বার্তা গ্রহণ এবং বার্তা প্রেরণের ব্যাপারে সক্ষমতা অর্জন করে।

মুজাহিদদের কাছে শক্তিশালী কোন ব্যবস্থাপনা নেই এবং তাদের কাছে গোয়েন্দাগীরি করার কোন আধুনিক সরঞ্জামাদিও নেই। তারা অধিকাংশ সময় মৌখিক বার্তা কিংবা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাদের বিশেষ কোড ভিত্তিক শব্দ দিয়ে সংবাদ পাঠান। দোস্ত আভোর খান প্রতি বছর ছুটি কাটানোর জন্য তার বাবার কাছে ভারত চলে আসে। কিন্তু এই বার সে একটি বিশেষ মিশনে ভারত এসেছে। এখন পর্যন্ত তাঁর বন্ধুরা আঁচ করতে পারেনি যে, সে মুজাহিদদের দলের লোক ও তাদের একজন ঝাঁনু গোয়েন্দা। তারা বরং তাকে তাদের মতই একজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার স্টুডেন্ট ও মোল্লা বিরোধী মনে করে। সেও তাদের সেই মনের বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে কোনভাবেই বুঝতে দেয়নি যে, সে মূলত মুজাহিদদের একজন চর।

।। ১০ ।।

বিমল দাসের ব্যাপারে মুজাহিদরা কখনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার হননি। তারা তার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। বিশেষ করে এবার হঠাৎ করে তার ভারত যাত্রাকে মুজাহিদরা গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন।

দিল্লীর একটি সাধারণ হোটেল যেখানে বেশ কিছু আফগান মুহাজেরীন আশ্রয় নিয়ে আছে। মূলত এটা হল মুজাহিদদের একটি গোপন আস্তানা। কিন্তু কেজিবি ও র-এর এজেন্টও তাদের মধ্যে রয়েছে- যারা মুজাহিদদের সহানুভূতির আঁড়ালে এখানে মিশে আছে। দোস্ত আভোর খানকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে এই হোটেলের ধারে কাছেও না ভীড়ে। সে দিল্লীর একটি নামী-দামী হোটেলে অবস্থান করছে। এ হোটেলটি তার জন্য নতুন নয়। সে এই হোটেলের কর্মচারীদের কাছে অপরিচিত নয়। কেননা, সে প্রতি

বছর এই হোটেলেরই মেহমান হত। তার বাবার ডজন ডজন হিন্দু-শিখ বন্ধুরা তার খাতিরদারী করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করত। সে সব সময় একাগ্রতা পছন্দ করত। পাঠানদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মভীরুতার কথা প্রতিটি হিন্দু ব্যবসায়ীরা ভাল করেই জানত। সে জন্যই তারা কোন সময় মদ-সূরার আসরে তাকে অংশ নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেনি। এক-দুবার তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এদিকে আগ্রহ না দেখে তারা তাকে আর ব্যতিব্যস্ত করাটা সমীচীন মনে করেনি। কারণ, তারা ভাল করেই জানত যে, এই যুবক শত প্রগতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাঠান। তাদের প্রকৃতিই একটু ভিন্ন ধরনের। এবার যখন সে ভারতে এসে এই হোটেলে ওঠল, তখন তার বাবার একজন শিখ বন্ধু তাকে একটি মোটর সাইকেল দিল শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য। সে পুরো দিন স্কুটারে বসে ঘুরাফেরা করে। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যেন, সে দিল্লী শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কি করছে—সে ব্যাপারে একমাত্র সে জানে আর আল্লাহ জানেন। মুজাহিদদের স্থানীয় এজেন্টকেও তার মিশনের ধরনের ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। দোস্ত আভোর খানকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দিল্লীর একটি স্থানীয় হোটেলের বাইরে প্রতিদিন এগারো বারোটার মধ্যভাগে একজন ব্যক্তিকে অপেক্ষমান অবস্থায় পাবে। তার সঙ্গে নির্দিষ্ট কোড বিনিময়ের পর নিজের প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সেই অপেক্ষমান ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করবে। আজ যখন সে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল, সেখানে একজন আফগানীকে সে দেখতে পেল। লোকটি একটি দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চে বসে পত্রিকা দেখছে। দোস্ত আভোর খানও একটি বিশেষ ইংলিশ পত্রিকা কিনে তার কাছে গিয়ে ঘেঁষে বসল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিশেষ কোড বিনিময়ের পর পরিচিতির ব্যাপারটি সমাধা হয়ে গেল। পরিচয়ের পর দু'জনের মাঝে আর কোন সংকোচবোধ রইল না। বিকাল ৩টায় দু'জনে একটি সিনেমা হলে ঢুকল। তাদের উদ্দেশ্য আদৌ সিনেমা দেখা নয়। আসল উদ্দেশ্য হল অর্জিত তথ্যগুলো পাচার করা। তার জন্য হলের চেয়ে নিরাপদ স্থান কোনটিই নয়। হলের গ্যালারীতে তেমন

ভীড় দেখা যাচ্ছে না। দুজনেই একটি নিরাপদ স্থানে বসে পড়ল এবং কয়েক মিনিটের ভিতর দোস্ত আভোর খান বিমল দাস সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলো সেই আফগানীর কাছে সমর্পন করল। হাফ টাইম হলে সেই নবাগত আফগানী সেখান থেকে উঠে কোথাও গায়েব হয়ে গেল। তার পরামর্শ অনুযায়ী দোস্ত আভোর খান পুরো সময় ধরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলের ভিতর বসে রইল। ফিল্ম দেখার চেয়ে সে আরামদায়ক সীটে বসে ঝিমালই বেশী। শো দেখার সময় শেষ হয়ে গেলে সে তার হোটেলে চলে এলো। এখন তার মধ্যে গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে। যেহেতু মুজাহিদদের কেন্দ্র থেকে বিমল দাসের ব্যাপারে খবরাখবর নেওয়ার জন্য যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা সে যথাযথভাবে আদায় করেছে।

সেই আফগানী দ্বিতীয় দিনই খুব সকালে কাবুলে নিজের জনৈক বন্ধুর জন্য একটি টেলিফোন বুক করল। মূলত সে ছিল মুজাহিদদের একজন চর। সে গোপন শব্দের মাধ্যমে বিমল দাসের দিল্লীর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তার কাবুলস্থ বন্ধুর কাছে তথ্য জানিয়ে দিল।

থাবা

বিমলদাস কয়েকদিন পরই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে করে কাবুল উড়ে গেল। সে ফয়জানকে হত্যা করার ব্যাপারে নিজের মনে কয়েকটি পরিকল্পনা করে রেখেছে। কিন্তু কেন জানি এক ধরনের উদাস ভাব তার মনটাকে বেকুল করে তুলছে। ভিতরে প্রচন্ড অশান্তি লাগছে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি কাবুল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে রুশ সেনাদের একটি চৌকস বাহিনী পুরো এয়ারপোর্ট ঘেরাও করে নিল। রাতের সময়টা এমনিই ভয়ানক। তার মধ্যে গত তিন-চার দিন ধরে মুজাহিদরা এয়ারপোর্ট এবং তার আশেপাশের এলাকায় প্রচন্ড হামলা চালাচ্ছে। এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল পুরোপুরি সেনা-বাহিনীর হাতে। প্লেন উঠা-নামা করার মুহূর্তে তারা সতর্ক।

প্লেনের যাত্রীদের তালিকা "ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টে" রয়েছে। সেখানে একজন কর্মচারী এদের নাম ও ঠিকানা টাইপ করার সময় বিমলদাসের নাম দেখে তার মুখে একটি মৃদু হাসি খেলে গেল। সে খুব শান্তভাবে সমস্ত তালিকাটি টাইপ করে ফেলল এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে সেটা পৌঁছিয়ে দিয়ে কেন্টিনে চা খেতে চলে গেল। আফগান আমলারা যে বিভাগেই কাজ করুক, তাদের টেলিফোন কলগুলো টেপ করা হয়; কিন্তু কেন্টিনে ফিট করা প্রাইভেট টেলিফোন বুথ সম্পর্কে এই কর্মচারীর দৃঢ় বিশ্বাস, যদি সে এখান থেকে কোন বার্তা পাঠায়, তাহলে সেটা হবে সবচেয়ে

নিরাপদ। চা খেয়ে সে ওঠে বুথের মধ্যে দুটি কয়েন ফেলল। তারপর নম্বর টিপল ঃ

"হ্যালো, আমি রাত দশটায় আসব।" এই সংক্ষিপ্ত পয়গাম দিয়ে ফোন রেখে দিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তার বার্তাটিও টেপ হয়ে গেল। তবে কেউ তার বার্তার মতলব বুঝতে পারল না এবং বার্তা প্রেরকের ঠিকানা এবং কোন্ নম্বরে ফোন করেছে, এসব কিছুই জানতে পারলো না। এ ছাড়া বার্তাটি এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না যে, এ ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাবে। একটা সংক্ষিপ্ত বার্তা, একজন আরেকজনকে তার আগমনের সংবাদ দিচ্ছে, ব্যস্ এটুকুই।

কেজিবির টিটি এক্সপার্ট "ক্ষতিহীন" লিখে ফাইল সামনে রেখে দিল।

।। ২ ।।

বিমলদাসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আফগান সামরিক বাহিনীর একটি জীপ দাঁড়ানো ছিল। তাতে রুশ সেনা সওয়ার রয়েছে। সে কোন কিছু না বলেই চুপচাপ জীপে বসল। জীপ চলতে শুরু করলে তার সাথে বসা অফিসারটি নিজের পরিচয় দিল। কেজিবির স্থানীয় কর্মকর্তা সে। আফগান ভাষায় সে এত স্পষ্ট ও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে যে, বিমলদাস অবাক না হয়ে পারল না।

"বিমল! আমাদের তথ্য অনুযায়ী, ফয়জান উগলু জালালাবাদেই রয়েছে। ভোরের আগে তুমি জালালাবাদ পৌঁছে যেতে পারবে। জালালাবাদের শস্যমন্ডিতে সে আসা-যাওয়া করে, এই সংবাদ আমরা অনেকবারই। চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তাকে খতম করে দেওয়া তোমার পক্ষে মুশকিল হবে না। আমাদের সশস্ত্র লোকেরা সিভিল পোশাক পরে তোমাকে সাহায্য করবে। আমাদের জন্য বড় সমস্যা হচ্ছে, জালালাবাদের স্থানীয় লোকদের কন্ট্রোল করা। স্থানীয় জনগণ বেশীরভাগই আমাদের বিরোধী এবং মোল্লাদের পক্ষে। এই কারণে ফয়জান উগলুকে খতম করতে হলে তার উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ না করে চোরাগুপ্তা আক্রমণ করতে হবে। যদি ভরা

বাজারে লোকজনের সামনে তার উপর আক্রমণ করা হয়, তাহলে জালালাবাদের পুরো জনবসতি আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"

সে কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার বিমলকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করল, "আমি তোমার কাছে কোন কথা লুকাব না। তুমি এখানকার লোকদের ব্যাপারে ভাল করেই জান যে, তারা হচ্ছে ধর্মভীরু। যে ধর্মকে আমরা আফিম সমতুল্য মনে করে তুচ্ছ জানি, সে ধর্মকে তারা প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। তারা আমাদেরকে শত্রু ভাবে ও চরম ঘৃণা করে। প্রতিদিন জালালাবাদ থেকে আমাদের সঙ্গীদের চার-পাঁচটি মৃতদেহ আমাদের কাছে পৌঁছুচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ওখানকার বাড়ীতে বাড়ীতে তল্লাশী নেওয়া, যেটা মোটেই সম্ভব না। এখন শুধু একটি পথই খোলা আছে সেটা হচ্ছে গুপ্ত আক্রমণ। গোপন তৎপরতার মাধ্যমে যদি কিছু করা যায়। নয় তো সরাসরি আক্রমণ করতে গেলে প্রতিটি বাড়ী আমাদের বিরুদ্ধে দূর্গের মত হয়ে যাবে। তোমার আসল রূপ ওখানকার লোকেরা জানে না। এটা আমাদের জন্য সু-খবর। তোমার উপর আমাদের অনেক আশা ভরসা। কাজ এমনভাবে হওয়া উচিত যেন কেউ মোটেও বুঝতে না পারে।"

"তাই হবে জনাব!" বিমলের মুখ থেকে খুব কষ্টে একথাটি বের হল। সে মনে মনে এ কথা ভেবে কেঁপে ওঠছে যে, রুশ ও আফগান সেনারা মিলে যে ব্যক্তির একটা কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না। বেচারা একা সেখানে কি ঘোড়ার ডিম করতে পারবে। আচ্ছা এমন তো নয় যে, সে কুরবানীর বলি হতে যাচ্ছে? কাবুলের একটি হোটেল থেকে সামান্য দূরে তারা বিমলকে নামিয়ে দিল। রাত তাকে কাবুলেই কাটাতে হবে।

।। ৩ ।।

ফয়জান উগলুর নাম এখন জালালাবাদের বাসিন্দাদের কাছে কোন অপরিচিত নয়। সে এখানে মুজাহিদদের অন্যতম বড় কমান্ডার। তার নাম প্রতিটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানে। তার দুর্ধর্ষ

মুজাহিদ সঙ্গীরা শত্রুর উপর ঈগলের মত ছোবল মারে এবং চোখের পলকে রুশ ও তার তল্পীবাহক আফগান সেনাদের টহলরত সেকশনের উপর আক্রমণ করে গায়েব হয়ে যায়। শত্রুবাহিনী কিছু বুঝেই উঠতে পারে না।

দোস্ত আভোর খাঁনের প্রথম সংবাদ পেয়েই ফয়জান চমকে উঠল। মুজাহিদরা শুরু থেকেই বিমল দাসের ব্যাপারে সন্দিহান। কিন্তু আজ তার প্রমাণও পাওয়া গেল। কালীর পুজারী বিমল দাসকে কাবুলেই নরকে পাঠিয়ে দেওয়া ফয়জানের পক্ষে কোনই ব্যাপার না। এয়ারপোর্টে কতর্ব্যরত তাদের বিশ্বস্ত সাথীর সংবাদ পাওয়া মাত্রই কাবুলের মুজাহিদরা পুরো প্রস্তুতির সঙ্গে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করল। কিন্তু ঠিক ঐ সময় যখন তারা সেই হোটেলটিকে ঘেরাও করে ফেলার জন্য এডভান্স হচ্ছে, তাদেরকে থেমে যেতে হল। জালালাবাদ থেকে জরুরী ভিত্তিতে নির্দেশ এল, যেন বিমল দাসকে মোটেও কিছু না বলা হয়।

।। ৪ ।।

সকালে ওঠে বিমল একটি প্রাইভেট বাসে জালালাবাদ অভিমুখে রওনা হল। ছুরুবীর কাছে পৌঁছতেই বাসটি এমন এক মারাত্মক সড়কে এসে গেল যার উভয় পার্শ্বে বিশাল বিশাল পাহাড়ের বেষ্টনী রয়েছে। হঠাৎ করে ড্রাইভারকে বাসে হার্ড ব্রেক কষতে হল। সামনের রাস্তাটি বন্ধ। বাস থামামাত্রই মুজাহিদদের একটি বাহিনী চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। তারা কোন যাত্রীকে কিছুই বলল না। তারা শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত বিমল দাসকে কাঁধে ওঠিয়ে পাহাড়ের কোথাও উধাও হয়ে গেল। যাওয়ার পূর্বে মুজাহিদ গেরিলারা বাস আরোহী আফগান মুসাফিরদের কাছে অনুরোধ করল যেন তারা এই ঘটনার কথা সরকারী কর্মকর্তাদেরকে না জানায়।

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাদের স্বাধীনচেতা আফগান ভাইয়েরা যারা তাদেরকে দেখামাত্রই আনন্দ ভরে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' বলে শ্লোগান দিয়েছে, তাদের কথা মেনে নিয়েছে। বিমল দাসের কল্পনাও আসেনি যে, সে এমনভাবে আচানক কিছু করার

পূর্বেই বিস্বাদ পাপের বলি হয়ে যাবে। সে বালক না যে, সে বুঝতে পারবে না, তাকে কোন্ অপরাধে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

সে ভেবে ওঠতে পারছে না যে, দিল্লীতেও মুজাহিদদের কোন হিতাকাঙ্খী রয়েছে, যে তার ব্যাপারে সমস্ত খবরা-খবর তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

গেরিলারা বিমলকে একটি গোপন আস্তানায় নিয়ে এলো। মুজাহিদরা তাকে এনেই জানিয়ে দিল, তাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে। সে যখন জানতে পারল যে, দিল্লীস্থ্ 'র' অফিসে যাওয়ার সংবাদ মুজাহিদরা পেয়ে গেছে তখন তার অন্তরাত্মা মৃত্যুর ভয়ে শুকিয়ে গেল। সে অনেক চেষ্টা করল মুজাহিদদেরকে এ কথা মানাতে যে, তারা যে তথ্য পেয়েছে, সেটা সত্য নয়। কিন্তু মুজাহিদরাও কম ঘাগু নয়। তারা জানে কীভাবে চরদের মুখ থেকে সত্য কথা বের করতে হয়। অবশেয়ে বিমল সত্য বলতে বাধ্য হল। বর্তমান হিংসাত্মক পরিকল্পনার কথাও স্বীকার করল। মুজাহিদরা সেসব আস্তানার কথাও জানতে পারল, যেখান থেকে প্রয়োজন পড়লে বিমলদাস সহযোগিতা পাবে।

বিমলদাসের ভবিষ্যত মজলিসে শুরার উপর ছেড়ে দিয়ে তারা দ্রুতগতিতে জালালাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

।। ৫ ।।

কিছুক্ষণ পরই একটি পাহাড়ের আঁড়ালে লুকানো রাশিয়ান ট্রাকে চড়ে রুশ সেনাদের উর্দি পড়ে পনেরজন গেরিলা মুজাহিদ ফয়জান উগ্‌লুর কমান্ডিং-এ জালালাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। ড্রাইভারের সাথের আসনে মুজাহিদ কমান্ডার ফয়জান বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একজন উচ্চপদস্থ্ রুশ সামরিক অফিসার। পথিমধ্যে বেশ কয়েকবার তাদের মুখোমুখী হতে হয় আফগান ফৌজি ট্রাকের। তারা মুজাহিদদেরকে রুশ সৈন্য মনে করে সে দিকে গভীর দৃষ্টি না দিয়ে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রতিটি আফগান সেনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। রুশ সেনাদের সামনে

তারা ভেজা বিড়ালের মত হয়ে যায়। তারা মুজাহিদদেরকে রুশ সেনা মনে করে তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। তারা দৃষ্টি নামিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

তখন রাত দশটা বাজতে যাচ্ছে। জালালাবাদের একটি থানার কাছে একটি ফৌজি ট্রাক এসে দাঁড়াল। তারা থানা হতে সামান্য দূরে এসে নামল। এখন পায়ে হেঁটে তারা সামনে অগ্রসর হচ্ছে। এই থানায় কেজিবির একটি চৌকস বাহিনী যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসা রয়েছে।

তারা থানার বিল্ডিংয়ের আঙ্গিনায় বিভিন্ন গ্রুপে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজবে মত্ত। অকস্মাৎ তাদের উপর যেন কিয়ামত এসে পড়ল। তাদের ঠিক বুঝে আসল না যে, ফায়ারিং কি আসমান থেকে হচ্ছে, নাকি জমিন থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী সেনা মৃত্যুবরণ করল। বাকী সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক পজিশন গ্রহণ করল; কিন্তু হঠাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে থানার পুরো ইমারতটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কাফের-বেদ্বীন সৈনিকদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইল।

।। ৬ ।।

সকাল দশটায় জালালাবাদ সামরিক ছাউনীতে অবস্থানরত রুশ সেনা অফিসারের নামে ডাক যোগে একটি চিঠি পৌঁছল। কর্ণেল মিখাইল বাহ্যিক দৃষ্টিতে একজন সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে এখানে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি হলেন কেজিবি'র স্থানীয় কন্ট্রোল কমান্ডার। যাচাই-বাছাই করার পাঁচ মিনিট পর তার সামনে তার টেবিলের উপর চিঠিটি রয়েছে। তিনি অস্থিরচিত্তে সেটি খুললেন। সেখানে খুবই সংক্ষেপে লেখা আছে ঃ

"ছাগে রুশ! ঈন আফগানিয়ান গুয়ূর আছ্ত, চেকোশ্লাভাকিয়া নীছ্ত।" (রুশ কুকুররা! শুনে রেখ, এটা চেকোশ্লাভাকিয়া নয়। এটা হচ্ছে স্বাধীনচেতা আফগানীদের দেশ।)

—কমান্ডার ফয়জান উগ্‌লু ❖

জি, আর, ইউ

বিমলের গ্রেফতারী এবং পরে তার হত্যা একদিকে যেমন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার জন্য বড় ধরনের ট্রাজেডী। অন্যদিকে ফয়জান উগলু আবারো তার বিরুদ্ধে পাঁতানো ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় কেজিবি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তারা সকলে এবারের ঘটনায় হতভম্ব।

মস্কোর একেবারে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি রহস্যে ঘেরা পুরনো বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে মধ্যরাতের পরও বাতি জ্বলছে। একটি বড় টেবিলের চুতর্পাশ্বে কেজিবির চারজন উচ্চপদস্থ্ কর্মকর্তা বসে আছেন। তাদের সামনে অনেকগুলো ফাইল। চারজনের স্নায়ু টানটান মনে হচ্ছে।

পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তারা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অন্তরে সুতীব্র ঘৃণা লালন করেন। এই চারজনের মধ্যে একজন, যিনি সকলের সিনিয়র এবং যার উর্দির কাঁধে সারি সারি স্টার তার জেনারেল হওয়ার নিদর্শন বহন করছে, রক্তখেকো চোখ দিয়ে তিনি সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। তিনি জি, আর, ইউ,-এর সেই শাখার প্রধান যার কাজ হচ্ছে আফগানিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা।

"তোমরা সকলে হচ্ছো আস্তা গর্দভ।" তিনি দাঁড়িয়ে হঠাৎ মাতালের মত চিৎকার করে তাদেরকে শাশাতে লাগলেন।

"কমরেড জেনারেল!" একজন কিছু বলতে চাইলেন।

"শাটআপ" তিনি গর্জে উঠলেন। "সে দিনের পুঁচকে ছেলে, তাকে তোমরা বশে আনতে পারছ না, অভিশাপ তোমাদের উপর!"

ক্রোধে তিনি এত জোরে গর্জন করে উঠলেন যে তার গলার রগগুলো ফুলে উঠল। আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কাশি শুরু হয়ে গেল। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। কাশির কারণে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। বাকী তিন অফিসার গাধার মত নিজনিজ আসনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বসে রইলেন। তাদের মনে এই জেনারেলের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু চেহারায় তা একদম প্রকাশ হতে দিলেন না। তারা এত সতর্কভাবে নিজেদের ক্রোধ সামলে নিলেন যে, যদি তারা ফৌজী অফিসার না হতেন, তাহলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অবশ্যই পুরস্কৃত হতে পারতেন!

কাশি শেষ হলে "জি, আর, ইউ"-এর জেনারেল ভ্লাদিমীরোভ হাঁপাতে হাঁপাতে আবার তাঁর আসনে ধপ করে বসে পড়লেন। তিনি নিজের সামনে রাখা ব্রিফকেস থেকে একটি প্লাস্টিকের বোতল বের করলেন এবং তার মধ্য থেকে একটি ট্যাবলেট হাতের তালুতে ঢেলে মুখে পুরে গিলে ফেললেন। এখন আস্তে আস্তে তাকে অনেকটা শান্ত মনে হচ্ছে।

"কর্নেল 'মিখাইল শোলোখোভকে পরশু আমার নিকট রিপোর্ট করার জন্য বার্তা পাঠিয়ে দাও। আমি এ ধরনের গাধাকে এক মিনিটের জন্যও বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নই। আর হ্যাঁ " তিনি আচানক একজন একজন করে তিনজনেরই চোখের উপর চোখ রাখলেন। তারপর বললেন, "এখন এ ব্যাপারটি সুপ্রীম কমান্ডের হাতে চলে গেছে। তারাই এখন সিদ্ধান্ত নিবেন, কী করতে হবে।"

তিনজনই জানেন, এ কথার উদ্দেশ্য কী! এখন তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে নীরবতা পালন করতে হবে। তাদেরকে একথা ভুলে যেতে হবে যে, এর পূর্বে তারা কখনো ফয়জান উগ্‌লু নামের কোন আফগান বিদ্রোহীর নামও শুনেছিলেন কিংবা রুশ গোয়েন্দা সংস্থা

কেজিবি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সহায়তায় তাকে হত্যা করার কোন প্ল্যানও বানিয়েছিল।

"গেট আউট।" তিনি তাঁর আসনে বসতে বসতে গর্জন করলেন।

"কমরেড জেনারেল"–তিনজন দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে উচ্চারণ করলেন ও তাকে সেলুট করলেন। তারপর নিজ নিজ ব্রিফকেস বগলে চেপে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

।। ২ ।।

জেনারেল ভ্লাদিমীরোভ তাদের চলে যাওয়ার আনুমানিক কয়েক মিনিট পরই কি যেন ভেবে ঐ মিটিং রুম সংলগ্ন একটি কক্ষে চলে গেলেন।

এ কক্ষটি এক রকম "জি, আর, ইউ" এর অপারেশন রুমে পরিণত হয়েছে। তিনি একটি লাল টেলিফোনে বিশেষ নম্বর ডায়াল করলেন।

দ্বিতীয় মুহূর্তেই তিনি সেক্রেটারী জেনারেলের সঙ্গে কথা বললেন। কথার্বাতা শেষ হলে তার স্নায়ুচাপ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি টেবিলের এক কোণে লাগানো একটি পুশ বটমের উপর আঙ্গুল রাখলেন। কয়েক মিনিট পর তিনি কফিতে চুমুক নিতে নিতে একটি চিঠি লিখলেন।

।। ৩ ।।

এ চিঠিটি পরদিন কুটনৈতিক ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দিল্লীস্থ রাশিয়ান দুতাবাসে পৌঁছে গেল। এই দূতাবাসের আনুমানিক আশি শতাংশ কর্মচারী সরাসরি কেজিবি'র এজেন্ট। তারা কুটনীতির আঁড়ালে নিজেদের গোপন তৎপরতা চালিয়ে যায়।

এদের মধ্যে ইউরি রাগুলিয়ান নামে একজন থার্ড সেক্রেটারী আছেন। রাগুলিয়ান যদিও বাহ্যত থার্ড সেক্রেটারী; কিন্তু তার

সামনে এখানকার ফার্স্ট সেক্রেটারীও কিছুই না। দূতাবাসের প্রতিটি কর্মচারী তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। সকলেই জানে, আসলে তিনি কে।

ইউরি রাগুলিয়ান জেনারেল ভ্লাদিমিরোভের চিঠিখানা মাত্র একবার পড়লেন। তারপর তার সামনে রাখা লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললেন।

দ্বিতীয় দিন রুশ দূতাবাসের লোকজন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কুটনৈতিক পর্যায়ে থার্ড সেক্রেটারী ইউরি রাগুলিয়ানের কান ব্যথার সংবাদটি ছড়িয়ে দিল। পরদিনই রাগুলিয়ান তার চিকিৎসার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে মস্কো চলে গেলেন। দিল্লী থেকে মস্কো পর্যন্ত সফরটি দৃশ্যত "খুবই কষ্টে" কাটে। এ সময়ে প্লেনে কর্তব্যরত লোকজনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায় যে, বাস্তবিক রাগুলিয়ানের কানে কোন মারাত্মক রোগ দেখা দিয়েছে!

মস্কোতে পৌঁছার আনুমানিক আধা ঘন্টা পর জেনারেল ভ্লাদিমিরোভ তাকে একটি বিশেষ মিটিংয়ের জন্য তলব করলেন। দু'জনে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত একটি নীল নকশা নিয়ে পর্যালোচনা করলেন।

।। ৪ ।।

তৃতীয়দিন যখন ইউরি রাগুলিয়ান আবারো দিল্লীস্থ দূতাবাসে পৌঁছলেন, তখন তার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক মনে হল। তবে ওষুধের ব্যাগটি তিনি জেনে-শুনে এমন ভঙ্গিতে এবং এত শক্তভাবে ধরে রাখলেন যেন সেদিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি পড়ে। তার "কানের রোগটি" বেশ পুরনো এবং মাসে একবার দু'বার এ সমস্যার কারণে তাকে "তার বিশেষ চিকিৎসক"কে দেখানোর জন্য মস্কো অবশ্যই যেতে হয়। বিমান বন্দরে "র" -এর একজন বিশেষ এজেন্ট তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখে। সে রুশ দূতাবাসের গাড়ীর পিছু নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে দূতাবাস পর্যন্ত সর্বক্ষণ ছায়ার মত লেগে থাকে। তার দায়িত্ব পালন করার পর সে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট "র"-এর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। ❖ ❖ ❖

নতুন শিকারী

ঠাকুর রমেশ কলকাতার সেই ঘনবসতি মহল্লার পুরনো আমলের চারতলা দালানটাকে কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করে নিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা দুলিয়ে বাড়িটির পুরনো ও ভগ্ন সিড়িগুলো বেয়ে চড়তে লাগল। খানিক পরই সে একটি কক্ষের দরজায় কড়াঘাত করল।

"কোন্ শালা-রে?" কেউ ভিতর থেকে গালি দিয়ে উঠল।

"ঠাকুর—তোর বাপ্।" ঠাকুর রমেশও কলকাতার বিশেষ বচনে উত্তর দিল।

"উহ্"! ভিতর থেকে শব্দ এল। তারপর কেউ উঠে দরজা খুলে দিল।

দরজা উন্মুক্তকারীর শরীরে শুধু একটি ধুতি দেখা যাচ্ছে, আর তাও মনে হয় ইমারজেন্সীভাবে তড়িঘড়ি করে গায়ে জড়িয়েছে। কামরায় ভয়ানক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

এক কোণে ছোট একটি টেবিলে কয়েকটি চায়ের কাপ ও কিছু বই-পত্র রয়েছে। অন্যদিকে একটি ঢিলে-ঢালা খাট বিছানো রয়েছে। তার উপর ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন প্রায় নগ্ন মহিলা শুয়ে আছে। ঠাকুরকে দেখা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন শালিনতার লক্ষণ দেখা গেল না। সে বিবস্ত্র অবস্থায়ই পড়ে রইল। কামরা থেকে মদের ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ বের আসছে।

ঠাকুর একবার সেই মহিলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। সে দ্বিতীয়বার মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না।

"তুই চলে যা" ধুতিপরা লোকটি দেওয়ালে গাড়া একটি লম্বা পেরেকে ঝুলানো পুরনো কোটের পকেট থেকে ১০০ রুপীর একটি নোট বের করে ঐ বেশ্যার দিকে ছুঁড়ে মেরে নির্দেশ দিল।

মহিলাটি কিছু না বলে চুপচাপ উঠে দাঁড়াল। নোটটি তার ছোট ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল। টেবিলের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে ওখানে রাখা লাইটার দিয়ে ধরাল এবং লম্বা লম্বা টান দিয়ে ধুতিওয়ালার দিকে তাকাল। আবার ঠাকুরের দিকে মুচ্‌কি হেসে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে অপাঙ্গে একটা ইশারা করল। কিন্তু ঠাকুর মশাই চোখ টিপে তাকে কি যেন বুঝাল। মনে হল, ঠাকুরের সাথেও ঐ বেশ্যার শরীরী সম্পর্ক রয়েছে। সে ঠাকুরের ইশারা বুঝতে পেরে খাটের পায়ার সাথে ঝুলানো কাপড় পরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

"লোকে আমাকে পান্ডে বলে" মহিলাটি বাইরে বেরোনের পর ঠাকুরের দিকে হাত বাড়িয়ে ধুতি পড়া লোকটি করমর্দন করে বলল।

"তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি অনেক আনন্দ বোধ করছি কমরেড পান্ডে!" ঠাকুরও বড়ই উষ্ণতার সাথে করমর্দন করল এবং বলল, "আমার নাম তো জেনেই নিয়েছো –এখন আমাকে কি করতে হবে, তা বলে দাও।"

"বসো" পান্ডে খাটের দিকে ইংগিত করে বলল। তারপর খাটের নীচ থেকে একটি টিনের ট্রাংক বের করে সেটা খুলে বসল। ট্রাংকটি পুরনো কাপড় দিয়ে ঠাসা।. সে একটি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি ছবি বের করে ঠাকুরের সামনে মেলে ধরল। ছবিটিতে চোখ পড়তেই ঠাকুর প্রভাবিত না হয়ে পারল না। ছবিটি একজন সুদর্শন যুবকের। লাল সাদা মিশ্রিত চেহারার মালিক।

"এর নাম কি?"

"ফয়জান–ফয়জান উগ্‌লু।" পান্ডে উত্তর দিল।

"থাকে কোথায়?" সে আবার রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল।

"আফগানিস্তানের কোন এক জায়গায়।"

"কি কি কি.....কি মতলব, আমাকে ওখানে যেতে হবে?" ঠাকুরের ওষ্ঠদ্বয় হঠাৎ কাঁপতে লাগল। ইতিপূর্বে মাত্র একবার তাকে একটি মিশনে কাবুলে পাঠানো হয়েছিল। তখনও তাকে এ ধরনের মিশন দেওয়া হয়েছিল।

বিদেশী দূতের স্থানীয় ড্রাইভারকে হত্যা করার মিশন। সেই ড্রাইভার কেজিবির এজেন্ট হয়ে সে দূতের গোপন খবরাদি কেজিবির কাছে পৌঁছিয়ে দিত। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কেজিবি ও 'র' তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার দায়িত্ব দেয় রমেশ ঠাকুরের উপর। সে তার দায়িত্ব পালন করে এবং সুযোগমত ড্রাইভারকে হত্যা করে।

"ঠাকুর! তোমাকে যে কোনভাবে হোক এ মিশন অবশ্যই সফল করতে হবে। ঐ যুবকটিকে এক মাসের মধ্যে খতম করতে হবে। এ নির্দেশটি সরাসরি "রেড স্কোয়ার" থেকে এসেছে। তুমি বালক নও। এর গুরুত্ব অবশ্যই।" ঠাকুরের মনে হচ্ছে, পান্ডের আওয়াজ কোন গভীর কুয়া থেকে উঠে আসছে।

"ঠিক আছে।" সে তার আঙ্গুলে ধরা সিগারেট মাটিতে ছুড়ে পা দিয়ে পিষে বলল।

পান্ডে একটা ম্যাপ এবং আরো কিছু ছবি তার সামনে মেলে ধরে তাকে কিছু বুঝাতে লাগল।

।। ২ ।।

ঠাকুর রমেশ পান্ডের মুখ থেকে নির্গত এক একটি শব্দ খুবই সতর্কতার সাথে ব্রেনের মধ্যে ঢুকাচ্ছে। সে প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী। এই ব্রেন তাকে পাতাল থেকে আকাশের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তার তো এখন এটাও মনে নেই যে, আসলে তার নাম কি!

এ পর্যন্ত সে ডজন ডজন নাগরিকত্ব, নাম এবং দেশ পাল্টিয়েছে। কখনো তাকে ইউরোপে দেখা গেছে, কখনো এশিয়ার কোন দেশে। আবার কখনো মধ্য প্রাচ্যের কোন আরব দেশে। তার মা তাকে জন্ম দিয়ে আশ্রমের সামনে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল। কে জানে কোন্ খোদাভীরু মানুষটি মায়া দেখিয়ে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে লালন-পালন করেছে, পড়া-লেখা শিখিয়েছে এবং পরে সে লোকটিও মারা গেছে।

তার উপকারী ও হিতাকাংখী লোকটি মারা যাওয়ার পর তার এ জগতে আর কে-ই-বা ছিল। কলেজ থেকে বি-এ কমপ্লিট করার পর সে আধুনিক বিশ্বের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। এখানে তার নিজের কোন পরিচিতি ছিল না। তাকে যে কোনভাবে নিজের পরিচিতি নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে। সে ভাল করেই বুঝতো যে, সে এই দেশে (ভারতে) থাকলে তার ভয়ানক এবং ট্রাজেডীর অতীত তার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকবে। তাকে ভাগ্যের খোঁজে সংগ্রাম করতে হবে। প্রয়োজন হলে দেশ ত্যাগ করতে হবে। সত্যিই একদিন সে বেরিয়ে পড়ল। বিভিন্ন দেশের মাটি ছেঁকে সে জার্মানীকে নিজের গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। ওদিকে তুরস্কে পৌঁছে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। তার হাতে মোটেও পয়সা কড়ি ছিল না। সে সড়কের ধারে বানানো এক পার্কে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আধমরা হয়ে বসে আছে। এমন সময় এক বিদেশী ফেরেশতা হয়ে তার কাছে হাজির হল। সে ঠাকুরকে শুধু খাওয়ালো না। নিজের সঙ্গে তার ঘরেও নিয়ে এল।

তার বাড়িটা কেমন ছিল! এ যেন পৃথিবীর বুকে এক অপরূপ স্বর্গ। ঠাকুর এখানে মদ, যৌবন ও কাবাবের মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে ফেলল। সে শরাবের মত্ততায় আত্মহারা হয়ে পড়ল। তার বিদেশী বন্ধুটি তাকে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ ঘুরাল। অবশেষে সে একদিন জেনেই ফেলল যে, সে কেজিবির জালে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সে মোটেও ঘাবড়াল না। সে তো আগেই নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কোন একটা উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধানে

নেমে ছিল। সে মনে-প্রাণে তাদের হয়ে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল এবং শুধু তাই নয়, যা বলল তা করেও দেখাল। দু' বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এমন সব কর্ম করল যে, এখন সে কেজিবির বিশেষ এজেন্ট হিসাবে গণ্য হতে লাগল। নিজের দেশ ত্যাগের ছয় বছর পর যখন সে দেশে ফিরল, তখন সে একজন কোটিপতি রঈস ও প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সে দিল্লীর একটি আধুনিক অভিজাত এলাকায় বিশাল বাংলো কিনে ফেলে এবং তার ব্যবসা পুরো ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে। কোন বিয়ে সাদী করেনি, তবে দিল্লীর এমন কোন অভিজাত যুবতী পাওয়া দুস্কর হবে যে তার অবৈধ শয্যা-সঙ্গী হওয়ার ভাগ্য অর্জন করেনি। দিল্লীতে ঠাকুরের গৃহটিই ছিল কেজিবির সব চেয়ে বড় আড্ডাখানা। প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন বাহানায় সে বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক প্রতিনিধিকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করত।

ইউরি রাগুলিয়ান ভারতে তার স্পাই মাস্টার নির্বাচিত হন। তাঁর ইংগিতে এখানেও সে অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

।। ৩ ।।

আজও সে এ ধরনের কাজের জন্য দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছে। পান্ডেকে দেখে সে মোটেও অবাক হল না। সে নিজের ব্যক্তিত্বকেও তো পান্ডের মত গভীর আবরনে ঢেকে রেখেছে। সে নিজের উপর এত মুখোশ পরিয়ে রেখেছে যে, এখন তার আসল ব্যক্তিত্বকে অনুসন্ধান করা খুবই মুশকিল ব্যাপার। আজ তার একটি অভিজ্ঞতা হল। সে অনুভব করতে পারল যে, তার মর্যাদা এখনো কেজিবির মামুলী এজেন্ট থেকে মোটেও বেশী নয়। না জানি পান্ডের মত আরো কতলোক ভারতের কোণায় কোণায় রয়েছে। সে জানে, কেজিবির গোয়েন্দা জাল পুরো বিশ্বে বিস্তৃত।

"আমাদের বন্ধুরা ওখানে তোমাকে সব ধরনের সহযোগিতা দিবে।" পান্ডে তার এই ভাঙ্গাচুড়া ট্রাংক থেকে একটা পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেট বের করে তার হাতে সঁপে দিয়ে বলল।

টিকেটটি দিল্লী থেকে কাবুল পর্যন্ত যাওয়ার।

"ওখানে কমরেডরা আছে। তারাই সমস্ত ব্যাপারে ব্রিফিং দিবে। ও কে গুডলাক।" পান্ডে তার কোন কথা না শুনেই বিদায়ী করমর্দন করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ঠাকুর রমেশ বাইরে বেরিয়ে এল।

সে কেজিবির গোয়েন্দাবৃত্তির সব কলাকৌশল শিখে নিয়েছে। সে জানে, এক সিক্রেট অন্য সিক্রেটের ব্যাপারে সামান্য সন্দিহান হয়ে পড়লে উভয়ের মরন অনিবার্য হতে পারে। দু'জনেই জানে, কোন তৃতীয় গুপ্তচর তাদের এই সাক্ষাতের ব্যাপারটি নজরদারী করতে পারে। তাই বেশীক্ষণ যদি তারা কথাবার্তা চালায় তাহলে তৃতীয় পক্ষের সিক্রেটের সন্দেহ জোড়ালো হতে পারে। এতে করে উভয়ের প্রাণও চলে যেতে পারে। গুপ্তচররা একজন আরেকজনের কাছে নিজের মতলব ছাড়া কোন বাড়তি কথা জিজ্ঞেস করে না। ঠাকুর পান্ডের কাছে জিজ্ঞেস করেনি, সে কাবুলে কার কাছে যাবে, কোথায় অবস্থান করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি.....।

সে জানে, যদি এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর প্রয়োজন হত তাহলে পান্ডে অবশ্যই তাকে বলে দিত।

পান্ডে যখন এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বলেনি, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাবুল বিমান বন্দরে তাকে খোশ আমদেদ জানানো ও সাদর অভ্যর্থনা দেওয়া হবে। অবশ্যই ওখানে পূর্ব থেকেই তার পরিচয় ও আগমনের ব্যাপারে খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

।। ৪ ।।

সন্ধ্যার ফ্লাইটে সে দিল্লী ফিরে এল।

ঐদিন রাতে দিল্লীর একটি শানদার হোটেলে সে ইউরি রাগুলিয়ানের সাথে ডিনার খাচ্ছিল।

"এই বিশেষ মিশনটি অত্যন্ত বিশ্বাসের কারণে তোমাকে সোপর্দ করা হয়েছে। যে খামটি আমি তোমাকে দিয়েছি, তা হচ্ছে তোমার

প্রেস কার্ড। তুমি দিল্লীর একটি ইংরেজী পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে কাবুল যাচ্ছ। সেখানে আমাদের বন্ধুরা জানে, ফয়জান উগ্‌লু কোন কোন এলাকায় যাতায়াত করে থাকে। তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার বাহানায় কোনভাবে সে পর্যন্ত পৌঁছবে ও তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করবে। কারণ তার দ্বারা আমাদের ও আমাদের সমর্থিত আফগান সরকারের চরম ক্ষতি ও পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে।"

"বিষ দিয়ে কেন?" ঠাকুর ঈষৎ হাসল এবং বলল, "যদি মিষ্টি দিয়ে কাজ সমাধা হয়ে যায় তখন ....?" সে কথাটি অসম্পূর্ণ রেখে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

"না ঠাকুর! ব্যাপারটা এত সহজ ভেব না। এমন চতুর লোকদের সঙ্গে তোমার কখনো পালা পড়েনি।" রাগুলিয়ান গাম্ভীরভাবে বললেন।

"উহ্! আফগানদের সাথে চতুরতার সম্পর্ক রয়েছে আবার?" ঠাকুর বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল।

"যাহোক, ব্যাপারটাকে গভীরভাবে নেবে। সামান্য অসর্তকতা তোমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে। আমি চাই না, তোমার অনুমান কোন ভ্রান্তির শিকার হোক। এ ব্যক্তিটি কোন মুর্খ মোল্লা নয়। মস্কো ইউনির্ভাসিটি থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আমাদের কলাকৌশল শিখে আমাদেরই উপর প্রয়োগ করছে। কমরেড ঠাকুর! তুমি আমার বন্ধু, একথাটি শুধু তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। ঘূর্ণাক্ষরে কেউ যেন জানতে না পারে। ইতিপূর্বে সে খোদ রাজধানী কাবুলে আমাদের ধুরন্ধর এজেন্টকে হত্যা করেছে। লোকটি অত্যন্ত ধূর্ত ও হুঁশিয়ার।" রাগুলিয়ান তার দিকে তাকিয়ে বলল।

একথা শুনে সত্যিকারভাবেই ঠাকুরের মধ্যে একটা গম্ভীর ভাব ছেয়ে গেল।

"কমরেড! আমার নামও ঠাকুর রমেশ। আমি তাকে অবশ্যই একটু দেখে নেব।" সে ভদ্‌কার এক লম্বা ঢোক গিলে বলল।

ও কে, গুডলাক"! ইউরি রাগুলিয়ান একজন অপরিচিত

লোককে হোটেলের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে বলল এবং সাথে সাথে দু'জনেই সতর্ক হয়ে গেল।

।। ৫ ।।

তৃতীয় দিন এয়ারইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ঠাকুর কাবুল যাচ্ছিল। তার পকেটে রয়েছে একটি বোতল, যার উপর "প্লীহা রোগ নিরাময়কারী" লেবেল লাগানো রয়েছে। মূলত, তাতে আছে দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মারাত্মক বিষ। আর কোন কিছু তার কাছে নেই। কাবুলে তার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত রাখা আছে। ইউরি রাগুলিয়ানের সঙ্গে আলোচনার পরও সে ফয়জানকে মোটেও পাত্তা দিতে প্রস্তুত নয়। সে বিশ্বের অনেক দেশে কেজিবির একজন পেশাগত হত্যাকারী রূপে এ যাবত ডজন খানিক লোককে হত্যা করেছে। কোন মানুষের প্রাণ সংহার তার হাতের খেলা। সে মানুষের শরীরে বিষ প্রয়োগের অনেক পদ্ধতি জানে। এ যাবত সে নিজের অনেক রূপ পাল্টিয়েছে। এখন যে কোন বেশ ধারণ করুক না কেন, সেটা তার কাছে ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। পাসপোর্ট ও প্রেস কার্ডে তার নাম মুহাম্মদ হুছাইন। রুশ গোয়েন্দা অফিসাররা ভেবেছে যে, প্রথম তো মুজাহিদরা প্রতিটি বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে সৌহার্দমূলক আচরণ করে থাকে। বিশেষ করে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী, অতিথীর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই ঠাকুর রমেশের মুসলিম নাম রাখায় তার প্রতি তারা বেশী বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তাকে সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করবে না। ফলে তার মিশন সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটি বিদ্যুতগতিতে কাবুল অভিমুখে উড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর তার আসনে পিঠ লাগিয়ে নিজের চতুর্দিকে সিগারেটের ধুম্র ছড়িয়ে কি যেন ভাবছে। এ পর্যন্ত সে ফয়জানকে হত্যা করার ব্যাপারে কয়েকটি সম্ভাব্য প্লান তৈরী করে ফেলেছে। প্লেন রাতের প্রথম প্রহরে কাবুল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল।

এবার কেজিবি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। "খাদ"-এর

যে এজেন্টটি ঠাকুরকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনার জন্য এসেছে, সে প্রথম থেকেই এখানকার লোকদের মাঝে সাংবাদিকরূপে পরিচিত ছিল।

বিমান থেকে নেমে যখন "কাস্টম ক্লিয়ারেন্স ডেস্ক"-এর পক্ষ থেকে তার মালপত্র চেক হচ্ছে, তখন তারা খুব ভাল করে সেগুলো চেক করল। কিন্তু এসবই হল লোক দেখানো। কারণ সবাই তাকে চিনে এবং কি জন্য সে এখানে এসেছে তা-ও জানে। তবে কেউ তার শরীর স্পর্শ করতে সাহস করল না। আজ বিশেষভাবে "খাদ" এর ট্রেনিং প্রাপ্ত এজেন্টরা কাস্টম অফিসাররূপে এয়ারপোর্টে ডিউটি পালন করছে।

লাউঞ্জ থেকে বের হতেই ঠাকুরের অভ্যর্থনার জন্য আগমনকারী "খাদ"-এর স্থানীয় এজেন্ট "ও হুসাইন ভাই! ও হুসাইন ভাই!" শ্লোগান লাগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। প্রত্যুত্তরে ঠাকুরও তার চেয়ে বেশী উষ্ণতা প্রদর্শন করল। উভয়ে অকৃত্রিম বন্ধুর মত কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসল। কারো সাধ্য নেই তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার।

"খাদ এজেন্ট" তাকে কাবুলের একটি হোটেলে নিয়ে এল। হোটেলে প্রবেশ করার পরও ঠাকুর রমেশ সাংবাদিকদের ভঙ্গিতে ক্যামেরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। দুজনই ইংরেজী বলতে বলতে এখান পর্যন্ত এসেছে।

তার বন্ধুটি হোটেলের B-০৪ কক্ষটি পূর্ব থেকেই তার জন্য বুক করে রেখেছিল। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সে ঠাকুরকে ফয়জানের বর্তমান পজিশন সম্পর্কে অবহিত করল। সে সম্ভাব্য সে সব জায়গা সনাক্ত করল যেখানে ফয়জানকে পাওয়া সম্ভব।

পানাহারের সময় হলে স্থানীয় বন্ধুটি তাকে তার সঙ্গে ডাইনিং হলে খাওয়ার জন্য আহবান করল। কিন্তু ঠাকুর তা অস্বীকার করে বলল" "বন্ধু! বিশেষ সতর্কতার কারণে আমি ডাইনিং হলে তোমার সঙ্গে খাব না এজন্য আমি দুঃখিত। আরেকটি কথা মন দিয়ে শুন, তা হল আমার পক্ষ থেকে স্থানীয় কমরেড বন্ধুদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দাও, তারা যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত কিংবা যোগাযোগ

করার মোটেও চেষ্টা না করে। প্রয়োজন হলে আমিই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে ঠাকুরকে স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে তার পদ্ধতি তাকে পরিপূর্ণভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুর সে সব কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। তার স্মরণ শক্তি খুবই প্রখর। এ গুণটি তার কাজের পক্ষে বড়ই সহায়ক। সে নিজের কাছে কিছুই লিখিত রাখে না। মেজবানকে বিদায় জানানোর জন্য ঠাকুর দরজা পর্যন্তও এল না। তার চলে যাওয়ার আধা ঘন্টা পর সে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের ভঙ্গিতে গাম্ভীর্য রক্ষা করে হোটেলের ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল। সে খাওয়ার হলে প্রবেশ করার সময় কাউন্টারে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। প্রত্যুত্তরে তারাও তাকে হাসি উপহার দিল। ঠাকুর কাছে এসে তাদের সঙ্গে উষ্ণতাভাবে করমর্দন করল এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম মুহাম্মদ হুসাইন। আমি একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার রিপোর্টার। সরকার ও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদীনের যুদ্ধের খবরাখবর নেওয়ার জন্য এখানে এসেছি।" ঠাকুর জেনে-শুনে "মুজাহিদীন" শব্দটি ব্যবহার করল। কারণ, সে কাউন্টারেই অনুমান করতে পেরেছে যে, এখানকার লোকগুলো সরকারের নির্যাতনের ভয়ে মুজাহিদদের বিরোধীতা করে, কিন্তু তাদের অন্তর মুজাহিদদের পদধ্বনিতে স্পন্দিত হয়। তাদের মনের মণিকোঠায় একমাত্র মুজাহিদদের জন্যই স্থান রয়েছে।

হলে অনেক টেবিল খালি। তবে বেশ কিছু লোকও সেখানে বসে পানাহার করছে। সে জেনে শুনে এমন একটি টেবিলের দিকে অগ্রসর হল যেখানে পূর্ব থেকেই একজন মোটা তাজা আফগানী বসা আছে, তাকে খুবই মডার্ন মনে হচ্ছে।

"হ্যালো"! তার কাছে পৌঁছেই ঠাকুর করমর্দনের জন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

"হ্যালো"। মোটা লোকটিও প্রত্যুত্তরে বলল। তবে তার মধ্যে

উষ্ণতা মোটেও দেখা গেল না; বরং কেমন যেন নিস্প্রভভাব। ঠাকুর মোটা আফগানীর কাছে নিজেকে একজন বিদেশী মুসলমান সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিল। সে বলল, "আমি মুজাহিদদের জেহাদী ভূমিকা শুনে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। তাই আফগানিস্তানে এলাম প্রত্যক্ষভাবে তাদের যুদ্ধ দেখার জন্য।"

মুজাহিদদের নাম শুনে মোটা আফগানীটির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বাহ্যিক ভাবে বুঝা যাচ্ছে, সে মুজাহিদদের নাম শুনতে মোটেও ভালবাসে না। সে ইংরেজী বুঝে, কিন্তু বলতে খুবই কষ্ট হয়। এজন্যই হয়ত ঠাকুরের কাছ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে, কারণ সে অনর্গল ইংলিশ বলছে। খাওয়া সেরেই সে ঠাকুরের কাছ থেকে ওঠে চম্পট দিল।

ঠাকুর নিজের জন্য হালকা খানার অর্ডার দিল। তার চার পাশের টেবিলগুলোতে এখন অনেক লোকের সমাগম। সবাই বসে খাবার খাচ্ছে। তাদেরকে শুনানোর জন্যই ঠাকুর খাওয়ার মুহূর্তে জোরে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ল। তার বিসমিল্লাহ পড়া শুনে বেশ কিছু লোক চমকে ওঠল এবং তার দিকে নজর উঠিয়ে দেখল। কিন্তু সে দৃষ্টি অবনত করে খেতে লাগল। কে তাকে দেখল সে দিকে তার একেবারেই যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। খানা খাওয়া শেষ হলে সে দোয়া করার ভঙ্গিতে হাত দুখানা উঠাল এবং জোরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলল। সকাল বেলা নাস্তা সেরে যখন সে এই হোটেল থেকে বিদায় নিল, তখন এই হোটেলে আগত প্রতিটি ব্যক্তিই আনুমান করে নিল, ভারত থেকে আগত মুহাম্মাদ হুসাইন নামের এই সাংবাদিক, যে ইন্ডিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার রিপোর্টার ও প্রতিবেদক, আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে তার অনেক হামদর্দী ও সহমর্মিতা রয়েছে এবং সে তাদের জেহাদী কৌশল দেখার আশা নিয়েই আফগানিস্তানে এসেছে। লোকেরা এটাও জেনে ফেলেছে যে, নবাগত সাংবাদিক একজন গোড়া মুসলমান ও ধর্মভীরু এবং ইসলামী মূল্যবোধকে মনে প্রাণে ভালবাসে। ঠাকুর কখনো জনসমক্ষে শরাব পান করত না। অথচ শরাব তো তার খানার

অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই যখন মদ খাওযার প্রয়োজন হয়, নিভৃত কক্ষে সে খেয়ে নিত, যেন তার ধর্মীয় সুনাম ক্ষুণ্ন না হয়। কাবুলে যেখানে সে অবস্থান করছে, স্থানীয় মেজবান তার রুমের ফ্রিজে আগে থেকেই ভদকা ভরা অনেক বোতল রেখে দিয়েছিল।

।। ৬ ।।

রমেশ ঠাকুর সারাটি দিন কাবুল শহর ঘুরে ফিরে কাটাল। সে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের মত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ নিল। লোকদের মাঝে সাক্ষাতের মুহূর্তে সে তাদেরকে এ রকম ধারণাটি নিশ্চিতভাবে দিতে চেষ্টা করল, সে একজন মুসলিম হওয়ার সুবাদে মনে প্রাণে আফগান মুজাহিদদের সংগ্রাম ও জেহাদকে ভালবাসে ও তাদের অন্ধ সমর্থক।

ঠাকুর রমেশ কোন কাঁচা প্লেয়ার নয়। সে ভাল করেই জানে যে, এখানকার আশি ভাগ লোক মনে প্রাণে মুজাহিদদের সমর্থক। তবে এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, তারা ভয়ের কারণে মুখে তা প্রকাশ করে না। সে আরো জানে যে, এখানে প্রতি পদে পদে মুজাহিদদের চর রয়েছে। বিশেষ করে প্রতিটি খবরাখবর মুজাহিদদের কাছে তাৎক্ষনিকভাবে পৌঁছে যায়।

এ খবরও মুজাহিদীন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে, ভারত থেকে মুহাম্মাদ হুসাইন নামে একজন সাংবাদিক এসেছে, যে শুধু নামেই মুসলমান নয়, অন্তরেও তার শক্ত ঈমান ও উম্মতের জন্য ব্যথা ও সহমর্মিতা রয়েছে। ঐদিন রাতের দ্বিতীয় প্রহরেই ফয়জান উগ্‌লুর কাছে তার ব্যাপারে সংবাদ পৌঁছে গেল। সে ঐ সময় কাবুলের উপকণ্ঠে মুজাহিদদের একটি কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল। সে এ সংবাদ শুনে তেমন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। এটাকে একটা সাধারণ ব্যাপারই মনে করল।

মরণ পথ

তৃতীয়দিন ঠাকুর রমেশ তার বিশেষ সফরে বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্যস্থান হচ্ছে লোগার।

লোগার প্রদেশটি হচ্ছে আফগানিস্তানের সঙ্গম স্থল। এখান দিয়েই কাবুল-কান্দাহার এবং কাবুল-হেরাত মহাসড়কটি চলে গেছে। রুশ ও আফগান সেনার পক্ষে এই সাপ্লাই লাইনটি হচ্ছে খাদ্যনালীর মত। এখান থেকে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ খতম করার জন্য এ যাবত তারা কয়েকটি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে; কিন্তু মুজাহিদদের প্রতিরোধ শক্তিকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি।

এই রণাঙ্গনের বিশেষ গুরুত্বের কারণে মুজাহিদদের বিভিন্ন গ্রুপ এখানে এক যোগে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বাংকার ক্ষুদে বেদ্বীন শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। ফয়জানও এখানেই জেহাদরত। ঠাকুর রমেশ তারই অনুসন্ধানে সেদিকে আসছে।

লোগার সেনাছাউনীর কাছে এসে সে বাস থেকে নেমে পড়ল। এই সেনা ছাউনী থেকে সামনে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারে না। ছাউনীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পাহারারত আফগান সৈনিকরা ঠাকুরকে থামতে বলল এবং সামনে অগ্রসর হতে তারা তাকে বারণ করল। কিন্তু সে তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে আরো সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আর্মির জোয়ানরা তাই তাকে গ্রেফতার করে তাদের কমান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। ঠাকুর মনে মনে

খুবই আনন্দিত হল। এপর্যন্ত সমস্ত কাজ তার মর্জি মোতাবেকই হচ্ছে। এসব ঘটনার দ্বারা তার পজিশন দৃঢ় হচ্ছে।

এখানকার কমান্ডিং অফিসার হচ্ছে একজন রুশ কর্ণেল। সে এই এলাকার এরিয়া কমান্ডার। তার অধীনস্ত বেশীর ভাগ সেনাই হচ্ছে আফগান। ঠাকুরকে তার কাছে নিয়ে আসতেই কর্নেল ইংরেজীতে তাকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কেন তার সৈনিকদের নির্দেশ উপেক্ষা করল! প্রত্যুত্তরে ঠাকুরের মুখ থেকে এমন কিছু বিশেষ শব্দ বের হল যে, রুশ কর্নেল চমকে ওঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানদেরকে বাইরে যেতে নির্দেশ দিল, যারা তাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

আফগান সৈনিকরা সেখান থেকে চলে গেলে তারা দুজন অন্তরঙ্গভাবে রুশ ভাষায় কথা বলতে লাগল। পনের-বিশ মিনিট পর কমান্ডার তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এল। নিজের দফতর থেকে বের হতেই তার চেহারার মধ্যে ভীষন রাগের চিহ্ন দেখা গেল; কিন্তু এসবই হল অভিনয়, লোকদেখানো। সে উপস্থিত আফগান সেনাদের সামনে ঠাকুরকে পশতু ভাষায় গালি গিয়ে বলল ঃ

"যদি তুমি মরতে এসে থাক, তাহলে যাও, নরকে যাও।"

দুজনই চমৎকার অভিনয় করল।

"কি বললেন আপনি স্যার!" ঠাকুর অপরিচিত ব্যক্তির মত ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞেস করল।

"তুমি সামনে যেতে চাইলে, নিজ দায়িত্বে যাবে। আমরা কোন ধরনের নিশ্চয়তা দিতে পারব না।" কর্ণেল ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিল।

"অহ হো" আপনারা আমার নিরাপত্তার কি ঘোড়ার ডিম নিশ্চয়তা দিবেন! আপনারা আপনাদের জীবনেরই তো কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না! ঠাকুর বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে বলল।

"শাট্‌আপ!" কর্ণেল ধমক দিল।

"মিষ্টার কর্ণেল! তুমি একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিকের সঙ্গে

কথা বলছ। তোমার কণ্ঠস্বর মার্জিত কর। নতুবা ।" ঠাকুর রাগে দাঁত কড়মড় করল।

কর্ণেল কোন উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

ঠাকুর সেখানে আফগান সেনাদের চেহারা দেখে ভালভাবেই আন্দাজ করতে পারল যে, তারা কর্ণেলের সঙ্গে তার রুঢ় বাক-বিতন্ডায় খুবই আনন্দিত।

সে স্মিত হেসে সকলকে "আসসালামু আলাইকুম" বলল। তাদেরকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সীতে বলল, আমি একজন মুসলমান সাংবাদিক। ভারত থেকে এসেছি প্রত্যক্ষভাবে মুজাহিদদের গেরিলা যুদ্ধ দেখার জন্য।" বলেই সে সামনের পর্বত শ্রেণীর দিকে পা বাড়াল।

।। ২ ।।

সে কিছুটা বেপরোয়াভাবে পায়দল হেঁটে চলল। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দুই আড়াই ঘন্টা সে বিরামহীন সফর করল, এখন পর্যন্ত সে কারোর মুখোমুখী হয়নি, কিন্তু এখন কেমন যেন মনে খটকা লাগছে যে, এত দীর্ঘ সময় হাটা সত্বেও মুজাহিদরা কেন তাকে ঘেরাও করছে না? কেন তারা এখনো পর্যন্ত তার মুখোমুখী হচ্ছে না? দীর্ঘ সময় ধরে সে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকটা ক্লান্তি অবসাদ তাকে ঘিরে ফেলল। তার চারদিকে স্বাধীন চেতা আফগান জাতির মত উঁচু উঁচু পর্বত শ্রেণী, যারা চিৎকার দিয়ে দিয়ে তাকে একথার অনুভূতি দিচ্ছিল যে, আফগানদের দৃঢ়তার মত তারাও দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য।

ঠাকুর ভাবছে, 'যদি ফয়জান মারাও যায় তবুও কি রুশ সাম্রাজ্যবাদের সয়লাব এসব আকাশচুম্বী পর্বতের সাথে টক্কর মারতে পারবে? "না কখনো না।" কোন অজানা শক্তি তার কর্ণকুহরে বলে দিল। তার মনে পড়ল আফগানদের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোগান "পাহাড় দুর্জয়, আফগান জাতিও দুর্জয়।"

একটি পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে এসে সে থেমে পড়ল এবং গভীর শ্বাস গ্রহণ করে কি যেন চিন্তা করল। তারপর নিজের কোমরে বাঁধা টুরিষ্ট ব্যাগ ও ক্যামেরাটি নিজের শরীর থেকে আলগা করে একদিকে রেখে দিল। জুতা খুলে প্যান্টের নিম্নাংশ উপরে টেনে একটি পাথরের উপর বসল এবং ঝর্ণার পানিতে নিজের পা দুখানা ঝুলিয়ে দিল। প্রথম প্রথম পানি তার কাছে খুব ঠান্ডা মনে হল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার পুরো অস্তিত্ব প্রশান্তিতে ভর গেল। দশ পনের মিনিট এভাবেই কেটে গেল। তারপর সে নুইয়ে হাতের তালু ভরে পানি পান করল। মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিল। এরপর উঠে দাঁড়াল। সে যে মাত্র ঘাড় ফিরিয়ে নিজের আসবাবপত্র উঠাতে যাবে, একটি শীতল ধরনের শিহরণ তার হাতকে বিদীর্ণ করে বিদ্যুত গতিতে ভিতরে ঢুকে গেল। দুজন মুজাহিদ কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার জীবনের বেশীর ভাগ এধরনের গুপ্ত মিশনে অতিবাহিত হয়েছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় শক্তির উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। তার কান খুবই তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। সামান্য পদধ্বনিও সে শুনে ফেলতে পারে। কিন্তু আজ এত ব্যতিক্রম কেন ঘটল? সে মোটেও বুঝতে পারেনি, মুজাহিদরা কখন এল এবং কোন্ দিক থেকে এল!

কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক করে নিল। "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।" ঠাকুর ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ হাসি ছড়িয়ে মুজাহিদ দু'জনকে খাঁটি মুসলমানদের ভঙ্গিতে সালাম করল এবং নিজের হাতখানা মোসাফাহার জন্য বাড়িয়ে দিল।

'ওয়াআলাইকুমুস সালাম' উভয় মুজাহিদ সমস্বরে উত্তর দিয়ে পরপর তার সঙ্গে মোসাফাহা করল।

"আমি মুহাম্মাদ হুসাইন। একজন জার্নালিষ্ট।" সে সংক্ষিপ্তভাবে নিজের পরিচয় দিল।

মুজাহিদরা প্রত্যুত্তরে শুধু গর্দান নাড়াল, অন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ঠাকুর জুতা পড়ল। আসবাবপত্র উঠানোর জন্য হাত বাড়াল; কিন্তু ক্লাশিনকোভধারী মুজাহিদরা তাদের রাইফেলের

ইশারায় তাকে নিষেধ করল। তাদের একজন এক সঙ্গী অন্যজনকে স্থানীয় ভাষায় কি যেন বলল। ঠাকুর কিছুই বুঝলো না। এক মুজাহিদ ঠাকুরের ব্যাগ ও ক্যামেরা উঠিয়ে নিল এবং আগে আগে চলতে লাগল। অন্য মুজাহিদটি ইংগিতে ঠাকুরকে তাদের মাঝখান দিয়ে চলতে নির্দেশ দিল।

"শুকরান...ধন্যবাদ" বলে সে খামোখা দাঁত বের করে স্মিত হেসে নিজের টানটান স্নায়ুকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল।

তারা আনুমানিক পনের মিনিট পায়ে হাঁটল। তারা একটি পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই ঠাকুর আরো তিন জন মুজাহিদকে দেখতে পেল।

"মিষ্টার হুসাইন! আপনাকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনি যে মাহাযে (রণাঙ্গনে) এসেছেন, ঘটনাক্রমে তার কমান্ড করছেন কমান্ডার ফয়জান উগ্‌লু।" তাদের মধ্য হতে জনৈক মুজাহিদ খুবই সাবলীল ইংরেজী ভাষায় ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলল।

তার মুখ থেকে তার নিজের নাম তারপর ফয়জান উগ্‌লুর নাম শুনে ঠাকুর প্রথম তো হতচকিত হল। কিন্তু এরপর তার হৃদয় খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল। তার যেন মনের আশা পূরণ হতে যাচ্ছে। সে নিজের সম্পর্কে যে সব কথা সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা মুজাহিদীন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সে গেরিলাদেরকে প্রবঞ্চিত করতে সফল হয়েছে। আরো আনন্দের কথা হচ্ছে যে, এই রণাঙ্গনে খোদ ফয়জান কমান্ড করছে, যে ফয়জানের অনুসন্ধানে সে এ পর্যন্ত এসেছে!

"বাহ্‌ কমরেড! কাজ হয়ে গেছে?" সে মনে মনে নিজেকে সাবাশী দিল।

।। ৩ ।।

"ও আমার খোদা! কতইনা আমার সৌভাগ্য। যে মুজাহিদের মহান কৃতিত্বের দরূন কাবুলের পাহাড়-পর্বত, অলি-গলি মুখরিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হতে যাচ্ছে।" ঠাকুর নবাগত মুজাহিদদের সামনে নিজের আনন্দ প্রকাশ করল।

"মিস্টার হুসাইন! আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই এলাকায় আরো ঘুরা-ফেরা করার অনুমতি আমরা আপনাকে দিতে পারি না। তবে আমাদের কমান্ডার যদি আপনাকে অনুমতি দেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। আপনাকে সবার আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে হবে।" যে মুজাহিদটি ইংরেজীতে কথা বলেছিল, সে বড় আদবের সাথে ঠাকুরকে সতর্ক করে দিয়ে বলল।

"বাহ! বাহ! অবশ্যই, অবশ্যই আমাকে তারই কাছে নিয়ে চলুন।" সে অস্থিরচিত্তে বলল।

"আরেকটি ব্যাপারে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব।" সেই মুজাহিদ হাতের ইশারায় তাকে থামতে বলল।

"কি ব্যাপার?" ঠাকুর চমকে ওঠল।

"আপনাকে এখান থেকে চোখের উপর পট্টি বেঁধে কিছু সফর করানো হবে। যদি কমান্ডার রাজি হন, তাহলে আপনাকে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দেওয়া হবে।"

"নিশ্চয় এতে আমার কোন আপত্তি নেই। যদি এটা আপনাদের নিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে আমাকেও তা পালন করতে হবে।" সে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে আবেগ ভরে বলল।

"শুকরিয়া।" সেই মুজাহিদটি বলল।

তাদের অন্য একজন সঙ্গী নিজের কাঁধে রাখা একটি কালো কাপড় দিয়ে ঠাকুরের চোখ দুটো বেঁধে দিল। আরেকজন মুজাহিদ হাত ধরে তাকে নিয়ে এগোলো। ঠাকুর খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। তাকে তো এখান থেকে পালানোর রাস্তাও স্মরণ রাখতে হবে। এখন তো মুজাহিদরা তার জন্য যে বন্দোবস্ত করেছে, তাতে করে পালানোর রাস্তা তার জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আনুমানিক তিন-চার মিনিট চলার পর ঠাকুর ঘোড়ার খুরে শব্দ শুনলো। খানিক পরই তাকে একটি ঘোড়ায় উঠিয়ে দেয়া হল। ঘোড়ার পিঠে বসে ঠাকুরের এখন ইউরি রাগুলিয়ানের সেই কথাটির গুরুত্ব অনুভূত হল, যাতে তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"রমেশ! ফয়জান উগ্‌লুর ব্যাপারে কোন ভ্রান্তির শিকার হয়ো না।" সে ভাবছে, আফগানীরা তো কখনো এত চতুর হয় না। মুজাহিদদের মধ্যে যখন এত চতুর ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি রয়েছে, তখন অবশ্যই তাদেরকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের বিজয় নিশ্চিত।

আনুমানিক আধা ঘন্টা তারা চলতে লাগল। এরই মধ্যে কয়েকবার তার সফর সঙ্গী মুজাহিদ সোলজাররা এই ব্যবহারের জন্য তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তারা ঠাকুরের ইচ্ছায় তার ফ্লাস্ক থেকে চা বের করে তাকে খাওয়ালো। আল্লাহ আল্লাহ করে সফর শেষ হল। যখন তার চোখ থেকে পট্টি খোলা হল, তখন সে নিজেকে পাহাড়ের খোলা অংশে বানানো একটি ঝুঁপড়ির সামনে দেখতে পেল। তার সামনে ফয়জান উগ্‌লু দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে।

"আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আমীর!" ঠাকুর অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলল।

"ওয়া আলাইকুমুস সালাম!" ফয়জান প্রত্যুত্তরে তার চেয়ে বেশী উষ্ণতা প্রদর্শন করে তার সঙ্গে করমর্দন করল।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য যে, আজ আমি ইসলামের সেই মহান মুজাহিদের দর্শন লাভ করতে পেরেছি।" ঠাকুর খামাখা নিজেই নিজের হালুয়া বের করছিল।

"না, মিস্টার হুসাইন! বড়ত্ব ও মহত্ব একমাত্র সেই আল্লাহপাকের যিনি আমাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয় স্থল। তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা, যার উপর ভরসা করে আমরা রাশিয়ার মত বিশাল দৈত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মুজাহিদ আমার মত। তারা সবাই প্রশংসার অংশীদার। আমরা সকলে মিলে জেহাদ করছি; কিন্তু যেহেতু আমি কমান্ডার, সেজন্য আমার নামটাই লোক সমক্ষে বেশী শোনা যায়। কিন্তু আমি ইসলামের একজন নগণ্য খাদেম বৈ কিছুই নই।" কথাগুলো এমন বিনয়, গাম্ভীর্য ও ধীর কণ্ঠে ফয়জান বলল, যা শ্রোতাকে বিমোহিত করতে বাধ্য।

ঠাকুর অনুভব করতে পারল যে, সে ফেঁসে গেছে। সে এমন

জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার সম্ভব নয়। তার মিশনটি তার কাছে জটিল হতে চলল। কিন্তু এরপরই সে নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল এবং নিজের কাপুরুষোচিত চিন্তার কারণে নিজের উপর অনেক গোস্যাও হল যে, সে কেন এসব অশিক্ষিত ও গোয়াড় লোকদের ভয়ে ভয় পাচ্ছে! এরা তো আধুনিক কলাকৌশল ও কুটচাল সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল নয়!

"মিস্টার ফয়জান! আফগানিস্তানে এসব কি হচ্ছে? এসব সরল সহজ মানুষ রাশিয়ার মত এত বড় পরাশক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করবে, যাদের কাছে হালকা অস্ত্র থেকে নিয়ে পারমাণবিক বোমাসহ হাজার হাজার টনের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য রয়েছে হাজারো প্রকারের রাসায়নিক গ্যাস। কিন্তু আপনার এ সব সাথী-যাদের কাছে নেই কোন আধুনিক অস্ত্র, এরা কি মোকাবেলা করবে?" ঠাকুর কেন যেন ফয়জানের সামনে দাঁড়ানো যুবক বৃদ্ধ ও বালক মুজাহিদদের দিকে ইংগিত করে কথাগুলো বলল।

"এরাই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস! আমাদের আসল ও নির্ভেজাল ইতিহাস, যারা সৌভাগ্যক্রমে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে এখনো মুক্ত রয়েছে। তাদের চেহারায় বিষণ্নতার যে ছাপ দেখা যাচ্ছে তাই হচ্ছে আমাদের গৌরবের বস্তু। তাদের শরীরে সে সব যখম রয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মজলুম ও নির্যাতিত মানুষের উপর করে থাকে। এরাই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস যাকে ক্ষত-বিক্ষত করার জন্য বে-দ্বীন, নাস্তিক সাম্রাজ্যবাদী ও তার দোসররা উঠে পড়ে লেগে গেছে।" ফয়জান এক নিমিষের জন্য থেমে দূর আকাশে উড়ন্ত একটি ঈগলকে দেখল। অতঃপর আবার ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"মিস্টার হুসাইন! সাম্রাজ্যবাদের ছোবল এতই মারাত্মক হয়ে থাকে যে, মজলুম কওমের ক্ষতগুলো ক্যান্সারে রূপ নেয়। নির্যাতিত জাতির সমস্ত নৈতিক কাঠামো গলে-পঁচে দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। পেশী শক্তি চলে গেলেও তারা তাদের পিছনে একটি পঙ্গু জাতি রেখে যায়। আপনি একজন সাংবাদিক। নিজের দেশের দিকেই দেখুন।

ফিরিঙ্গীরা দুইশ বছর পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের লোকদের কত উপায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছে? তারা সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য কিই বা না করেছে? প্রতিক্রিয়া সেখানেও হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও প্রতিরোধ জন্ম নিয়েছে এবং এমন গাদ্দার ও তল্পী বাহকও জন্ম নিয়েছে যেমন আপনি ইদানিং কাবুল ও লোগারে দেখতে পেয়েছেন, যাদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতও হয়েছে। পিছন দিক থেকে পিঠে ছুরিকাঘাতকারী এসব বিশ্বাসঘাতকরাই পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে খতম করেছিল। এসব নিমকহারামরাই ফতেহ আলী টিপু সুলতানকে শহীদ করে দিয়েছিল, যিনি নিজের পরাজয়কে কখনো মেনে নেননি। তিনি একটাই শ্লোগান দিয়েছিলেন, "সিংহের একদিন শিয়ালের একশ বছরের চেয়ে উত্তম।"

এটা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে মহান শ্লোগান। তিনি শহীদ হওয়ার মুহুর্তেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিলেন। আমরাও মৃত্যুবরণ করবো, শহীদ হব। কিন্তু মরণের মুহুর্তেও সাম্রাব্যবাদের মুখে ঘৃণাভরা থুথু নিক্ষেপ করে যাব! ইনশাআল্লাহ। মিষ্টার হুসাইন! আমাদের নিজস্ব একটি ইতিহাস রয়েছে। আমরা এমন এক উত্তরসূরী যাদের পূর্বপুরুষরা খায়বরের পর্বত শ্রেণী থেকে ইসলামের জ্যোতি উজ্জ্বল করেছেন এবং হিন্দুস্তানের কুফরিস্তানকে ঈমানের আলো দ্বারা উদ্ভাষিত করেছেন। আমরা এজন্য গর্বিত যে, আমরা দিগ্বিজয়ী মাহমুদ গজনবী (রঃ) এর অনুসারী। আমরা 'বুত্‌শেকান' (প্রতিমা উৎপাটনকারী)। আমরা রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিমাকেও ঈমানী জরব দ্বারা খান খান করে ফেলব। আপনি কাবুল থেকে এসেছেন। সেখানে আরেকটি চিত্র দেখেছেন। ওখানে আমাদেরই আফগানী ভাইদেরকে দেখেছেন, যারা নিজেদের দ্বীন-ঈমানকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অদৃশ্য রোগ ঢুকেছে, সেটা হল কুফর, কপটতা ও ধর্ম বিমুখতার রোগ। এই রোগের কারণেই আমাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফাটল ধরেছে। এই সব মোনাফেক ও মুরতাদ শাসক শ্রেণীই এক

ভিনদেশী নাস্তিক সাম্রাজ্যবাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সুলতান মাহমুদ গজনবীর সন্তানদের রক্ত চুষার জন্য, যারা প্রতিদিন মুসলিম মায়ের কোল খালি করছে। এ দেশীয় মীরজাফর ও মীর ছাদিকদের আস্কারায় রুশ ভল্লুকরা মুসলিম আফগানকে রক্ত রঞ্জিত করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল করার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ধর্মবিমুখতা ও খোদাদ্রোহিতা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মিস্টার হুসাইন! আজ যে সব আফগান এই লাল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গ দিচ্ছে তারা আমাদের ইতিহাসের হিরু নয়। পূর্বেও ছিল না। বর্তমানেও নয় এবং ভবিষ্যতেও হবে না; বরং তারা হচ্ছে ভিলেন। তারা হচ্ছে কলঙ্ক। আমরা আফগানদের প্রকৃতিতে গোলামী ও দাসত্ব বলতে কোন শব্দ নেই। আমরা স্বাধীন প্রকৃতির। আমরা ঐ সব মোনাফেক, মুরতাদ বেঈমান এবং আমাদের ইতিহাসের কলংক ক্যান্সার রোগীদেরকে আমাদের জাতীয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করব ইনশা আল্লাহ। অচিরেই এই নব্য ফেরাউন ও তার দোসরদেরকে আমুদরিয়ার ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে মারবো ইনশাল্লাহ।”

ফয়জান খামোশ হয়ে গেল। সে যেভাবে বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় নিজের জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করছিল। তাতে ঠাকুর রমেশের মনে হল কেউ যেন তার মস্তকের উপর হাতুড় দিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানছে। এ পরিস্থিতি তার জন্য ভীষণ পীড়াদায়ক। কেন জানি একটা অদৃশ্য ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল।

“ওহ্, আমি ও কত বেকুব হয়ে গেছি। আপনাকে কোন্ কথার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছি। আপনাকে এসব মুজাহিদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দেই।” ফয়জান ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলল।

“অবশ্যই, অবশ্যই!” ঠাকুর ঢোক গিলে বলল।

সে প্রচন্ডভাবে চাচ্ছিল এই মানসিক পীড়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি পেতে।

“এর নাম কি?” ঠাকুর নিজের কলম ও নোট বুক নিয়ে ফয়জানের পার্শ্বে দাঁড়ানো একটি বার বছরের বালকের দিকে ইংগিত

করে জিজ্ঞেস করল। বালকটি অত্যন্ত গভীরভাবে নিজের রাইফেলখানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিল। মনে হয় খানিক পূর্বে সে তার রাইফেলটি পরিষ্কার করেছে।

"এর নাম ওমর খান।" ফয়জান উত্তর দিল।

"বাহ, চমৎকার ব্যাপার! এত ছোট বয়সে ক্লাসিনকোভ হাতে!"

"মিস্টার হুসাইন! এই বালক উড়ন্ত পাখীকেও শিকার করতে পারে। কারণ ওর ধমনীতেও তো প্রবাহিত হচ্ছে পূর্বসূরীদের রক্ত। আমিও আপনার মত কখনো কখনো ভাবি যে, এসব বাচ্চার সঠিক স্থান যুদ্ধের ময়দান নয়। এ বয়সতো হচ্ছে স্কুল ও মাদ্রাসায় যাওয়ার, শিক্ষা অর্জন করার। কিন্তু আমাদের সকলের উপরতো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ লড়ছি। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটাকে আমরা চরম কাপুরুষতা মনে করি!!"

ফয়জান ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফার্সিতে কি যেন বলল। বালকটি ঈষৎ হেসে ঠাকুরের দিকে তাকাল।

"এর বাবা কোথায়?" ঠাকুর জিজ্ঞেস করল।

"শহীদ হয়ে গেছে। ওর বাবা, বড় ভাই, মা এবং ছোট বোন সকলেই শহীদ হয়ে গেছে। কেউ শহীদ হয়েছে জঙ্গী বিমান থেকে বোমা বর্ষনে। কেউ শহীদ হয়েছে শত্রুদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে গিয়ে। ওদের পরিবারেই নয়; বরং ওদের পুরো গ্রামে শুধু ও একাই বেঁচেছে।

"কি ভয়কর! এই বালকটি একাই বেঁচেছে? এমন নৃশংসতা ও বর্বরতা কোন মানুষ মানুষের উপর চালাতে পারে?" ঠাকুর অকৃত্রিম অভিনয় করে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ মিস্টার হুসাইন! এ বালকটির কাহিনী খুবই মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক। ওর কাহিনীটি একটু শুনুন। সেদিনটি ছিল সোমবার, মে, ১৯৮২ ইংরেজী সন। আমরা এই মারকাজেই অবস্থান করছিলাম। আমাদের মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারশ।

এখানকার কমান্ডিং দায়িত্ব ছিল আমার। আমার সহযোগী হিসেবে ছিলেন মাওলানা আরসালান খান রাহমানী সাহেব। আমরা ফজর নামায আদায় করে কিছুক্ষণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে ট্রেনিং-এ ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ করে উত্তর দিকে থেকে অনেকগুলো বোমারু বিমানের শব্দ পেলাম। সেগুলো যে বোমা বর্ষন করছিল তা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এখান থেকে উত্তরে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে জাদরান নামের গ্রামের উপর শত্রু বাহিনী আক্রমণ করেছে। আমি সংগে সংগে সকল মুজাহিদকে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিলাম। মাওলানা আরসালান খান রাহমানীর পরামর্শে তিনশ মুজাহিদকে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করে তখনি স্পর্শকাতর এলাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দেড়শ মুজাহিদের কমান্ড আমার হাতে এবং অন্য দেড়শ'র কমান্ড মাওলানা রাহমানীর হাতে ছিল। আর বাকী মুজাহিদকে এই মারকাজ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখলাম। আমাদের হাতে ছিল ক্লাসিনকোভ, ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড ও বেশ কিছু ভারী অস্ত্র।

জাদরান গ্রামে পৌছে সত্যিই দেখলাম হাজার হাজার রুশ সেনা শ' খানেক ট্যাংক নিয়ে গ্রামটি দখল করে ধবংসলীলা চালাচ্ছে। আমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওয়ামা রামাইতা ইয-রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা-রামা" আয়াতটি পড়ে ফায়ার শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য মুজাহিদীনরাও ফায়ার শুরু করে দিল। আমরা অতর্কিতভাবে এমন সাড়াশি আক্রমণ করলাম যে, রাশানরা হতচকিত হয়ে পড়ল। রাশানরা ভাবেনি এত জোরদার পাল্টা আক্রমণ হতে পারে। আমরা হালকা তোপও ব্যবহার করছিলাম। প্রায় আট ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলল। এরপর রাশানরা পশ্চাদপসারণ করল। সন্ধ্যা হতে মাত্র দেড় ঘন্টা বাকী ছিল। রাশানরা চলে গেলে আমরা গ্রামের লোকদের অবস্থা দেখার জন্য ঘরে ঘরে ঢুকলাম। প্রতিটি ঘরে মৃতদেহ পাওয়া গেল। যাদের মধ্যে ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক, যাদেরকে রাশানরা শহীদ করে দিয়েছিল। এরপর আমরা ঐ গ্রামের মসজিদে ঢুকলাম। মসজিদের

ভিতর ও মসজিদের মেঝেতে প্রায় দেড়শ মুসলমানের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পেলাম। তাদের রক্তে মসজিদ ও আঙ্গিনা রক্তিম আকার ধারন করেছে। তাদের রক্ত থেকে একটা আশ্চর্য ধরনের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল। পুরো পরিবেশকে করছিল বিমোহিত। আমি মাওলানা আরসালান খানকে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা সাহেব! আমার নাকে তো একটা আজব ধরনের ঘ্রাণ পাচ্ছি যা দুনিয়ার কোন ঘ্রাণের সাথে মিল খাচ্ছে না। আপনাদের কি অভিমত?

মাওলানা বললেন! "মুহ্তারাম কমান্ডার সাহেব! আমিও তো সেই একই ধরনের ঘ্রান পাচ্ছি। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘ্রাণ। তারপর অন্যান্য মুজাহিদরাও সেই একই কথা বলল। আমাদের তখন এক্বীন হয়ে গেল যে, এটা শহীদানের কারামত।

এরপর আমরা মসজিদ থেকে লাশগুলো সরাচ্ছিলাম। হঠাৎ কয়েকটা লাশের নীচে একটা বালকের গোঙ্গানীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই আহত বালকটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে আনা হল। বালকটির উরুতে গুলী লেগেছিল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমরা বালকটির ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ করলাম এবং তাকে ওষুধ দিলাম। ফলে ও অনেকটা আরাম বোধ করল। পুরো গ্রামের মধ্যে মাত্র এই বাচ্চাটিই বেঁচে যায়। তাও লাশের নীচে পড়ার কারণে। সেই বালকটি হচ্ছে এই ওমর খান। আমরা লাশগুলো গণনা করলাম। তার মধ্যে পরুষ ছিল ২০১ জন, মহিলা ছিল ২৮৭ জন এবং বাচ্চা ও শিশুদের সংখ্যা ছিল ২২১ টি। এভাবে সেই জাদরান গ্রামে মোট ৭১৭ জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। আমরা শহীদানের লাশ দাফন করে সেই স্থানগুলোতে গেলাম যেখানে রাশিয়ানদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে দেখলাম শত শত রাশিয়ানদের লাশ পড়ে আছে। লাশগুলো গণনা করলাম, তাতে সংখ্যা দাঁড়াল ১০০৮ জন। তাদের প্রায় বিয়াল্লিশটি ট্যাংক পড়ে থাকতে দেখলাম; এগুলোর অধিকাংশ রকেট লাঞ্চারের আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। এ যুদ্ধে আমাদের সতের জন মুজাহিদ সঙ্গী শাহাদাতবরণ করেন। শত্রুদের অনেক অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের

হস্তগত হয়। মিস্টার হুসাইন! এ ধরনের শত শত ঘটনা প্রতিনিয়ত এখানে ঘটছে। রাশান ও তার সেবাদাস আফগান নাস্তিক সৈনিকরা নিরীহ লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। আমরাও সকলে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমরা বিদেশী হামলাকারী এই রুশ ভল্লুকদেরকে অবশ্যই অবশ্যই নিজেদের পবিত্র ভূমি থেকে বের করে ছাড়ব। না হয় আমরা নিজেরাই এ প্রচেষ্টায় শেষ হয়ে যাব। আমরা আফগানিস্তানকে রাশিয়ানদের জন্য কবরস্থান বানিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ!"

"মিস্টার ফয়জান! আমার খেয়াল, আমাকে নিজের কিছু পেশাগত দায়িত্বও পালন করা উচিত!" ঠাকুর ঈষৎ হেসে বলল। সে ফয়জানের এক সঙ্গীর সাথে, যে কিছু কিছু ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারত, বিভিন্ন ফ্রন্ট লাইনে ঘোরাফেরা করল। সে পেশাগত সাংবাদিকদের মত ওখানকার বিভিন্ন মুজাহিদীনের সঙ্গে মত বিনিময় করল এবং তাদের জেহাদী জযবার অনেক প্রশংসা করল। সে মুজাহিদদের ট্রেনিং ও অস্ত্র-সস্ত্রের অনেক ছবি ওঠাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে কাটাল।

সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলে সে ফিরে এল।

রাতের খানা ফয়জানের সঙ্গেই তার খাওয়ার কথা রয়েছে। সে লোক দেখানোর জন্য মুজাহিদদের সঙ্গে জামাতের সঙ্গে নামাযও পড়ল। তার কোন কর্ম ও চাল-চলন দ্বারা এটা বুঝা গেল না যে, সে মুসলমান নয়। সন্ধ্যায় কামান্ডার ফয়জান যখন ফ্রন্ট লাইন পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এলো তখন সে ঠাকুরকে তার জন্য অপেক্ষমান দেখতে পেল। সে ফয়জানের কাছে নিজের এই আশা ব্যক্ত করল যে, সে রাতের বেলায় নিভৃত কক্ষে, যেখানে সে আর ফয়জান ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তার ইন্টারভিউ গ্রহণ করবে!

।। ৪ ।।

ফয়জান ও ঠাকুর মুখোমুখী বসা ছিল। ঠাকুর পেশাগত সাংবাদিকের মত তার ইন্টারভিউ নিচ্ছে। হঠাৎ ফয়জানের একটি

বাক্যে সে চমকে ওঠল ঃ

"আপনার আংটিটি খুবই চমৎকার!"

বাক্যটি শুনে ঠাকুরের পুরো শরীরে মারাত্মক ধরনের শিহরণ খেলে গেল। এই আংটির পাথরের স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘড়ি ফিট করা আছে। তারই একটি গোপন স্থানে বিষ রাখা ছিল, সেই বিষ খুবই ধীরগতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে!

"জি, হ্যাঁ!" সে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বলল। আমি এ আংটিটি জাপান থেকে কিনেছি। মিস্টার ফয়জান! আমার একটি বড় দুর্বলতা রয়েছে, আমি ঘড়ি কোন সময় হাতে লাগাই না। বিশেষ করে এ ধরনের মিশনে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমার এই আংটি দ্বারা ঘড়ি এবং আংটি উভয় প্রয়োজনই পূরণ হচ্ছে!"

"বাহ, খুব সুন্দর কথা।" ফয়জানের ঠোঁটের কোনে ঈষৎ হাসি।

একজন মুজাহিদ বিনয়ের সঙ্গে উভয়ের সামনে দস্তরখানের উপর খানা রেখে দিল।

"আমার মনে হয় বাকী কথা খাওয়ার পরে হোক।"

ফয়জান বলল।

"আপনার যেমন মর্জি।" ঠাকুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসল।

"আমি হাত ধুয়ে আসি।" ফয়জান দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইল এবং বাইরে চলে গেল।

ঠাকুরের হৃদয়টি আনন্দে নেচে ওঠল। এত বড় মহাসুযোগ সে আর কখনো কি পাবে? ঠাকুর আঙ্গুল বাকা করে সামান্য চাপ দিল, ফলে ঘড়িটি ঢাকনার মত খুলে গেল, হাতকে সে সামান্য হেলালো এবং আংটির গোপন স্থান থেকে পানির মত স্বচ্ছ দু-তিন ফোটা বিষ ফয়জানের ওখানে রাখা পানির পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিল। এ ধরনের আরেকটি পানীয় পাত্র তার সামনে রাখা ছিল। একটি বড় প্লেটে তরকারী ও দস্তরখানের উপর রয়েছে বড় বড় তন্দুরী রুটি। আংটি আবার তার অবস্থায় নিজে নিজেই ফিরে আসল। বাইরে থেকে ফয়জানের পদধ্বনি কানে ভেসে এলে সে একদম স্বাভাবিক হয়ে

বসে রইল। মনে হল যেন কোন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু সে ভাবতেও পারেনি যে, তার পিছন থেকে কে কখন ঢুকে ক্লাশিনকোভের তীক্ষ্ম মাথাটি তার গর্দানের সঙ্গে চেপে ধরেছে।

।। ৫ ।।

"মিস্টার! তুমি যে কেউ হও না কেন! বেশী চালাকী দেখানোর চেষ্টা কর না। এটা ওয়ার্নিং, বুঝে আসছে? কাবুল এয়ারপোর্টে অবতরণকারী প্রতিটি বিদেশী আমাদের অতিথী। কিন্তু শত্রু কিংবা তার এজেন্টকে আমরা কখনো ক্ষমা করি না। তোমার চাল-চলন শুরু থেকেই সন্দেহজনক ছিল। অতি সত্বর তোমাকে বলতে হবে তুমি কে?" ফয়জান নিশ্চিন্ত মনে তার সামনে বসে বলল।

"কিন্তু তুমি কে? এটা জেনে আমাদের কী আসবে আর যাবে! আমরা তো জেনেই ফেলেছি যে, তুমি একজন অমুসলিম, মুসলমান নামটি তোমার মুখোশ। তোমার অবগতির জন্য বলছি যে, তোমার সামনে পানির পাত্র রাখা, তারপর আমার ওঠে যাওয়া, এসবই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত, যেন তুমি কোন পাত্রে বিষ ঢাল এবং ফলে ধরা পড়। আমি এটা ভাল করেই জানি যে, তোমার আংটির গোপন স্থানে সেই বিষ রয়েছে যা রাশিয়ার বিশেষ গোয়েন্দা ও এজেন্টরা ব্যবহার করে থাকে। এ বিষ শরীরে প্রবেশ করার কমপক্ষে চার ঘন্টা পর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে তুমি নিশ্চিন্তে চলে যাওয়ার জন্য চার ঘন্টা সময় পেয়ে যেতে। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি তোমার মিশনে সকলকাম হলে না।"

তার মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি শব্দ বর্শার ফলার মত ঠাকুরের কলিজায় গিয়ে বিধল। সে ভাবল এ ব্যক্তিটি কত জ্ঞান রাখে, এত হুঁশিয়ার ও সতর্ক ব্যক্তির সঙ্গে পুরো সাত মহাদেশে আজ পর্যন্ত তার পালা পড়েনি। "মৃত্যুর পূর্বে শুধু একটি কথা জেনে নাও যে, যদি তুমি কোন অমুসলিম সাংবাদিক হয়েও এখানে আসতে এবং তোমার পেশাগত দায়িত্ব তুমি পালন করতে, তাহলেও আমরা তোমাকে অনুরূপ সম্মান দেখাতাম। এসব সত্বেও তুমি যদি চুপ-চাপ চলে

যেতে তাহলেও আমরা কিছুই বলতাম না। কিন্তু এখন.........।" ফয়জান মৃত্যুর ভয়ে বিস্ফারিত ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

"তোমাকে তারা হয়ত পূর্ব ইউরোপের কোন ক্যাম্পে ট্রেনিং দিয়েছে। আর তুমি অবশ্যই মূলত ইন্ডিয়ান নাগরিক ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যাহোক এসবে আমাদের কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে এখন তোমাকে যে কোন অবস্থাতে মরতেই হবে। তুমি স্বয়ং নিজেও জানো যে, তোমার বিফল প্রত্যাবর্তনে কেজিবি তোমাকে মেরে ফেলবে। তাই আমরাই তোমাকে কেন মেরে ফেলব না?"

"আমা.....আমাকে ক্ষমা করে দিন।" ঠাকুর হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল।

"তুমি তো অত্যন্ত কাপুরুষ। মৃত্যুকে এত ভয় কর, তাহলে এখানে কি জন্য এসেছ! রাখ এসব কথা, এস প্রথমে খানা খেয়ে নিই।" তারা এমনভাবে খানা খেল যেন কোন কিছুই ঘটেনি। ঠাকুরের রগ থেকে রক্ত যেন নিংড়ে ফেলা হয়েছে। ভয় তার প্রতিটি পশমের গোড়ায় ঢুকে গিয়েছে। তার হাত পা কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ল। মৃত্যুর আশংকায় তার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছে না। এটা একজন মুজাহিদের ঈমানী জযবার প্রতাপ যা কেজিবির একজন পেশাগত হন্তাকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলেছে।

"আমার মনে হয়, তুমি জীবনের শেষ খাবার খেয়ে নাও।" ফয়জান মুচকি হেসে ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলল।

তার মরন এত পীড়াদায়ক হবে, কখনো সে কল্পনাও করেনি। কত অসহায়ের মত সে মরতে যাচ্ছে। ঠাকুরকে আজ নিজের পূর্বের সমস্ত অপরাধ মনে পড়ল। এক একজন করে সে সব নিহত লোকের অবয়ব তার সামনে ভেসে উঠল, যাদেরকে সে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তার হাতের এই আংটিটি না জানি কত মানুষের প্রাণ সংহার করেছে। সে প্রতিবার নিজের শিকার খতম করার নতুন

নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। এ বিষয়ে সে হল মহাপারদর্শী। কিন্তু সে এ জিনিসটা কখনো ভাবেনি যে, তার মরনটাও এত সহজেই এসে যেতে পারে।

।। ৬ ।।

"লোগার" সেনা ছাউনীর 'ওপি'র চোখে লাগা দূরবীনটি পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে একটি ঘোড়াকে সেদিকেই আসতে দেখল। তখন তার চমকিত হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সে চিৎকার করে কিছু দূরত্বে অবস্থিত মেশিনগানের বাংকারে রুশ সৈনিককে লক্ষ্য করে কি যেন বলল। প্রথমে অনিচ্ছা সত্বেও রুশ সৈনিকের হাতটি ট্রিগারের দিকে বাড়ল; কিন্তু কি ভেবে তার আঙ্গুল থেমে গেল। সে বাংকারে সেট করা টেলিফোন দিয়ে তার কমান্ডারকে সংবাদ জানাল। পরক্ষণেই কমাণ্ডার সেখানে উপস্থিত হল। রুশ কর্ণেল চোখে দূরবীন লাগাল। সে ঘোড়ার উপর রশি দিয়ে বাঁধা একজন মানুষ দেখতে পেল।

"তার দিকে নিশানা তাক করে রাখ। যদি কোন বিপদজনক কিছু দেখ, তাহলে নির্দ্বিধায় গুলী চালাবে।" কর্ণেল রুশ সিপাহীকে নির্দেশ দিল।

তার সাথে সাথে সে তিনজন আফগান সেনাকে ঐদিকে পাঠিয়ে দিল, যেন ছাউনী থেকে দূরেই তারা ঘোড়াটিকে রুখে নেয়।

আফগান সেনারা অনিচ্ছা সত্বেও সেই মিশনে রওনা হয়ে গেল। যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে, মুজাহিদরা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য এভাবে পাঠিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটাতে চাচ্ছে। ব্যাপারটি আসলে খুবই বিপদজনক। কোন রকমে তারা ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার লাগামটি চেপে ধরল। ঘোড়ার পিঠের উপর লোকটি দেখে তারা আচম্বিত না হয়ে পারল না। আ রে এতো সেই সাংবাদিক যে আজ সকাল বেলায় মুজাহিদদের ক্যাম্পের দিকে চলে গিয়েছিল।

।। ৭ ।।

ঘোড়া তার পিঠের বাহন সহ রাশান কর্নেলের সামনে দাঁড়ানো ছিল। কর্ণেল ঠাকুর রমেশের মৃতদেহ রশি থেকে মুক্ত করল। তার সব আসবাবপত্রও তার সঙ্গে বাঁধা ছিল।

ঠাকুরের গলায় তাবিজের মত একটি চিঠির খাম ঝুলছে। সবার পূর্বে কর্ণেল·সেই খামটি ছিড়ল। ভিতর থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে এলো, তাতে রুশ ভাষায় লেখা ছিল ঃ

"আল্লাহর সৈনিক ফয়জান উগ্‌লুর পক্ষ থেকে কেজিবির কর্তৃপক্ষের নামে।

তোমাদের প্রেরিত উপহার তোমাদের কাছেই ফেরত পাঠাচ্ছি। আমরা তাকে সেই বিষ পান করিয়েছি যা তোমরা আমাদের জন্য পাঠিয়েছিলে।

নতুন উপহারের অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদ

ফয়জান উগ্‌লু

রুশ কর্ণেল দাঁত পিঁষতে পিষঁতে সে পত্রখানা আবার খামে পুরল এবং দ্রুতগতিতে তার কক্ষে চলে গেল।

সে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে, ঠাকুরের লাশ ও তার আসবাব-পত্র কী করা হবে সে ব্যাপারে সে নির্দেশ দিতেও ভুলে গেল। খানিক পরেই সে সেটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে "কেজিবি হেড কোয়ার্টারে ঠাকুর রমেশের মর্মান্তিক মৃত্যুর বিশদ রিপোর্ট পেশ করল।

আহমাদ তুরসুন

কর্ণেল মিখাইল শোলোখোভের জন্য এই সদ্য আঘাতটা মৃত্যুর বার্তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কারণ সে জানে, এখন ব্যাপারটা সরাসরি কেজিবির হাতে চলে গেছে। তার কাবুল অবস্থানের সময়ই বিমল দাসের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে পড়ে, যা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। যার কারণে পূর্ব থেকেই উপরস্থ কর্মকর্তারা তার উপর চরম নাখোশ। এখন আবার রমেশ ঠাকুরের ঘটনাটা ঘটল। এখন যে কোন মুহুর্তে তার পদচ্যুতি ঘটতেই পারে। এমন কি তার উপর শাস্তি বিধানও জারি হতে পারে। সে এখন ভাবছে, অবশ্যই এখানে "খাদ" এর হেড কোয়ার্টারে মুজাহিদদের কোন লোক রয়েছে। কিন্তু সে কে? এ প্রশ্নটি রীতিমত তার মস্তিস্ককে তোলপাড় করে চলল। সে নিজের বিবেচনা এবং বুদ্ধিমত এখানকার আফগানদের চারপাশে তথ্য সংগ্রহের যে জাল বিস্তার করে রেখেছে এবং যেভাবে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছে, এরপরও এটা কীভাবে সম্ভব হল যে, সেই ব্যক্তিটি তাদের দৃষ্টির আঁড়ালে থেকে তাদেরই বিরুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করছে! সে ভাবছে আর পেরেশান হচ্ছে। অন্ধকারে মশা মারার মত অবস্থা তার। সে চিন্তা করে কুলিয়ে ওঠতে পারছে না যে, কোন পথে অগ্রসর হলে সে তার কাঙ্খিত ব্যক্তিটিকে ধরতে পারবে। সে নিজের কামরায় একাই বসা আছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত একের পর এক সিগারেট টানার কারণে এখন তার গলায়

চুলকাচ্ছে। হঠাৎ করে তার মাথায় একটা প্লান এল। তার স্পাট চেহারার টান টান স্নায়ুটা কিছুটা শান্ত হয়ে এল।

সে তার টেবিলে রাখা বটম চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন উর্দী পরা সান্ত্রী ভিতরে ঢুকল।

"আহমাদ তুরসুনকে ডেকে নিয়ে এসো।" সে সান্ত্রীর দিকে দৃষ্টি না তুলেই নির্দেশ দিল। সান্ত্রী তখনি উল্টো পায়ে বেরিয়ে গেল।

টর্চার সেলে যখন সানাঈকে এ সংবাদটি শুনানো হল যে, আহমাদ তুরসুনকে "অপারেশন চীফ" হঠাৎ করে তলব করেছে তখন তার আনন্দ আর ধরে না। সে ধরে নিল যে, হয়ত এখন সে চিরকালের জন্য আহমাদ তুরসুনের হাত থেকে মুক্তি পাবে। কারণ কর্ণেল শোলোখোভ আজ পর্যন্ত কাউকে সাবাশী দেওয়ার জন্য তলব করেনি। সে নিজেই দৌড়ে এসে আহমাদ তুরসুনের কাছে পৌঁছল।

"তোমার জন্য তো সুসংবাদ এসেছে!" সে তুরসুনের উপর দৃষ্টি পড়তেই বাঁকা সুরে বলল।

"কি?" তার ষষ্ট ইন্দ্রীয় সুসংবাদের পরিবর্তে আগাম বিপদ সংকেত দিচ্ছিল। "তোমাকে কর্ণেল শোলোখোভ এখনি তলব করেছে। তার বিশেষ সান্ত্রী বাইরে দাঁড়ানো রয়েছে।"

খানিকের জন্য আহমাদ তুরসুনের মনে হল যেন তার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে অনেকটা সামলে নিল।

"ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আমি লঙ্গরখানার হিসাব-নিকাশ করছিলাম, আপনি সেগুলো একটু দেখে নিন।" এ বলে আহমাদ তুরসুন বাইরে বেরিয়ে এলো।

সানাঈ তার ব্লকের দরজা পর্যন্ত তাকে ছাড়তে এলো। দরজার কাছে একজন সশস্ত্র সান্ত্রী দাঁড়ানো।

"আপনাকে কর্ণেল সাহেব স্মরণ করেছেন।" সে আহমাদ তুরসুনকে দেখামাত্রই স্যালুট মেরে বলল।

"চল।"

আহমাদ তুরসুন তার সঙ্গে যাওয়ার সময় ভাবছে যে, অবশ্যই তার কোন চাল-চলনে কর্ণেল শোলোখোভের সন্দেহ হয়েছে। সে এখনো পর্যন্ত সানাঈ সম্পর্কে "কাজের কথা" কর্ণেল পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কর্ণেলের রুমের সামনে পৌঁছলে দরজায় সশস্ত্র গার্ডরা তার দেহ তল্লাশি নিল এবং তার সার্ভিস রিভলবার নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে দরজা খুলে তাকে ভিতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। টানা সিগারেট খাওয়ার কারণে রুমটি ধূয়া দিয়ে ভরে গেছে। মনে হয় শীতের কারণে কর্ণেল এগজাস্ট ফ্যান চালায়নি। আহমাদ সিগারেট পান করত না। ভিতরে প্রবেশ করে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পেরেশানী বেড়ে গেল। কর্নেল শোলোখোভ তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে খিঁড়কীর বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দেখছিল। যেই মাত্র সে আহমাদ তুরসুনের দিকে ঘুরল, জুনিয়র অফিসারের পা দুটো আপসে মিলে গেল এবং সে খটাক শব্দ সৃষ্টি করে স্যালুট মেরে কর্ণেলকে সম্মান দেখাল।

"তোমার পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদ পেলাম না।!" কর্ণেল তার অভ্যাস অনুযায়ী সরাসরি আহমাদ তুরসুনের স্নায়ুর উপর আঘাত করল।

"স্যার! আমি তার উপর পুরোপুরি নজরদারী করে যাচ্ছি।" আহমাদ তুরসুন নিজেকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে বলল।

"ও গর্দভ! আমি তোমাকে নজরদারী নয়, রিপোর্ট করার জন্য বলেছিলাম –রিপোর্ট –রিপোর্ট– " শোলোখোভ নিজের হাতের ছড়িখানা জোরে আরেক হাতে মেরে প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ল। তুরসুন ভাল করেই জানে যে, কর্ণেল রিপোর্ট বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছে।

"যে কোন প্রকারে হোক শোলোখোভের কণ্ঠ খুবই ভয়ঙ্কর!। তার মুখখানা রক্তখেকো ড্রাকুলার মত হয়ে গেছে! তার এই ভয়ঙ্কর রূপের কারণে এখানকার কর্মচারীরা তাকে "হিংস্র দানব" বলে ডাকে।

"আমার কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোন ভাবে হোক সানাঈ এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। এর বেশী কিছু আমি বুঝি

না।” সে রীতিমত ছড়িটি এক হাত দিয়ে অন্য হাতের উপর আঘাত করল। শোলোখোভ তুরসুনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। তুরসুনের মনে হল তার ছোট ছোট চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে।

সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। মনে হল যেন তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছে।

“গেট আউট” কর্ণেল হুংকার ছাড়ল।

আহমাদ তুরসুন যখন তার কক্ষ থেকে বের হল, প্রচন্ড শীতের দিনেও তার শরীর ঘামে ভিজে গেল। ডিউটিরত গার্ডরা বড় সম্মানের সাথে তার পিস্তলখানা তাকে ফিরিয়ে দিল। আহমাদ তুরসুন বিষন্ন মনে ভারি পা ফেলতে ফেলতে তার ব্লকে ফিরে এল। সে জানে যে, শোলোখোভ এ সব চক্কর এ জন্য চালাচ্ছে, যাতে ইসফানদিয়ার খানকে অপমান ও চাকুরিচ্যুত করা যায়। সানাঈ যেহেতু ইসফানদিয়ারের ঘনিষ্ট মানুষ, কাজেই যদি কোনভাবে প্রমাণ করা যায় যে, মুজাহিদদের সঙ্গে সানাঈয়ের যোগসূত্র রয়েছে, তাহলে “খাদ” এর ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ারের পক্ষে ও তার পদে বহাল থাকা অসম্ভব হবে। এমন হলে হয়ত সে নিজেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হবে, না হয় তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও বদলী করা হবে।

কিন্তু সে কেন অহেতুক নিরীহ নিরপরাধ বৃদ্ধ সানাঈয়ের জন্য মুসিবত ডেকে আনবে! শোলোখোভ জাহান্নামে যাক! সে সানাইয়ের জন্য কোন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ানোর আগেই এখান থেকে চলে যাবে। এমনিতেও সে এই চাকুরী আফগান সরকার কিংবা নিজের পেটের জন্য করছে না, করছে মুজাহিদদের জন্য, ইসলাম ও মুসলমান ভাইদের জন্য। তুরসুন এ সব ভাবল এবং পরদিনই সে চুপচাপ এখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। সোজা সে মুজাহিদদের মারকাজে পৌছে গেল। এখন তার স্থানে অন্য কেউ মুজাহিদদের জন্য তথ্য পাচার করবে।

❖ ❖ ❖

পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্র

বাইশ দিন কষ্টকর সফর করার পর সে নানগারহার পৌঁছল। এখানকার জনপদগুলো এখন আর তার কোন অপরিচিত নয়। এখানকার প্রতিটি অনু-পরমাণু তাদের সঙ্গে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই জনপদ অতিক্রম করেই তার পূর্বপরুষরা কোন এককালে হিন্দুস্তানের কুফরিস্তানকে ঈমানের জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত করেছিলেন। ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন উপমহাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। আজ ফয়জান সেই পথে সফর করছে আশ্রয়ের সন্ধানে।

জালালাবাদ থেকে এখানে অনেক পাহাড়-পর্বত, গিরি-উপত্যকা দিয়ে লুকিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। সময় লেগেছে সাত দিন। সাধারণত এ পথ দু'দিনেই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু এখন যেহেতু কেজিবি তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে–তারা হয়ে গিয়েছে পাগলা কুকুরের মত। এজন্যই সে দূর্গম ও বন্ধুর পথ বেছে নিয়েছে। ফলে রাশান কমান্ডো, খাদ ও কেজিবির এজেন্টরা তার ধারে কাছেও ভিড়তে পারেনি।

শত্রুরা লোক চলাচলের পথগুলোতে গোয়েন্দাগিরির বিস্তীর্ণ জাল বিছিয়ে রেখেছে। তাদের গুপ্তচরেরা মুজাহিদদের বেশ ধারন করে বিভিন্ন মারকাজে (মুজাহিদীন কেন্দ্রে) ঢুকে বসে আছে। তারা অধীর আগ্রহে ফয়জান উগ্‌লুর অপেক্ষা করছে। যে চর তাকে গ্রেফতার

করে এনে দিতে কিংবা হত্যা করতে পারবে তার জন্য আফগান ও রুশ সরকারের পক্ষ থেকে মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তারই আশায় চররা ফয়জানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

ফয়জান জানে যে, তার অভ্যর্থনার জন্য মুজাহিদদের মারকাজে "খাদ" -এর কোন না কোন এজেন্ট অবশ্যই রয়েছে। কারণ সে শত্রুদের মামুলি ক্ষতিসাধন করেনি। তাদের উপর এমন আঘাত হেনেছে যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা তাদের যখম চাটলেও তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর নয়।

বিমল দাসের মৃত্যু আফগানিস্তানে কেজিবি নেটওয়ার্ক এর মৃত্যুর সমান। তারপর রমেশ ঠাকুরের মৃত্যু তাদের অন্তরে শোকের বন্যা এনে দেয়। শত্রুদের জন্য এ খবরটাও "এটম বোমা" বিস্ফোরণের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নয় যে, "খাদ" এর হেড কোয়ার্টারেও মুজাহিদদের চর রয়েছে এবং বিশ্বের যেখানে যেখানে আফগান মোহাজিররা বিচরণ করছে, সেখানে রয়েছে মুজাহিদদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর! তাদের গোয়েন্দাজাল এতই বিস্তীর্ণ, এত তৎপর! এ সংবাদে শত্রুদের হৃদপিন্ডে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা যে সব লোককে অশিক্ষিত, মুর্খ ও গোঁয়ার ভেবেছিল, তারা তাদের কুটচালগুলো ধরে ফেলতে পারছে, তাই না, সঙ্গে সঙ্গে সেই চাল ও কৌশলগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়ার মত যোগ্যতা ও জ্ঞানও তাদের আছে। রাজধানী কাবুলের আশে পাশে জিহাদরত মুজাহিদরা যখন তাদের মিশন সমাপ্তির পর নিজ নিজ ক্যাম্পে চলে যায়, তখন যাওয়ার পথে তারা বিভিন্ন মুজাহিদ ছাউনীতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। তারপর নিজ ক্যাম্পে পৌঁছে। কিন্তু ফয়জান কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। সে অপরিচিত ও দূর্গম রাস্তা অবলম্বন করল। পথে বিভিন্ন গ্রাম ও উপত্যকাবাসী তাকে আপ্যায়ন করাল। এভাবে কোন রকমে সে নানগারহার পৌঁছল। এবার তার সফর সঙ্গী কেউ নেই। একাই সে সফর করছে। সাধারণত কাফেলাবদ্ধ হয়েই তারা সফর করে। কিন্তু নাজুক পরিস্থিতির কারণে এবারে সে এ পন্থাটি বেছে নিয়েছে। নানগারহার থেকে খায়বার গিরি পথ ধরে সে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে পৌঁছে গেল।

।। ২ ।।

এরপর সে একদিন বন্নু হয়ে মিরানশাহ চলে এল। মিরানশাহ হচ্ছে একেবারে আফগান বর্ডার লাগোয়া। এখানেই বিশাল আফগান উদ্বাস্তু শিবির রয়েছে। মুজাহিদদের পরিবারবর্গ বেশীর ভাগ এখানে বসবাস করছে। মুজাহিদরা বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানে চলে আসে। এখানকার পাকিস্তানীরা তাদের আফগান মোহাজির ভাইদের প্রাণ উজাড় করে সাহায্য সহযোগিতা করে। তাদের মধ্যে আনসার-মোহাজিরদের মত সম্প্রীতি ও ভালবাসা রয়েছে। মুজাহিদদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় মারকাজ এবং ঘাঁটি ঝাওয়ার যা পাকতিয়া প্রদেশের অন্তর্গত, এখান থেকে বেশী দূরে নয়। হঠাৎ করে এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, শত্রুরা ঝাওয়ারের উপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এ সংবাদ শুনে প্রতিটি মুজাহিদ গ্রুপ চিন্তিত হয়ে পড়ে। ফয়জান আগেই জানতে পেরেছে যে, শত্রুরা খোস্তে তাদের ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি করছে। খোস্ত গ্যারিসনে দুশমনদের ব্যাপক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য তার কাছে সুস্পষ্ট। সে জানে যে, বাড়ী, লিঝা ও ঝাওয়ার মারকাজগুলোতে মুজাহিদরা যেভাবে উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে এবং তাদের অবস্থানগুলো সুসংহত ও সুদৃঢ় করে চলেছে। তাতে শত্রুরা ভীষনভাবে আতংকিত যে, এসব মুজাহিদীন ঘাঁটি দিনে দিনে তাঁদের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে জন্যই শত্রুরা এসব ঘাটির উপর নিজেদের পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এসব এলাকার পাহাড়গুলোতে মুজাহিদরা দুর্ভেদ্য বাংকার বানিয়ে সেখানে ফিট করে রেখেছে বিমান বিধ্বংসী কামান। এসব বাংকার এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, শত্রুরা তা দেখতে পায় না। তারা বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

।। ৩ ।।

মিরানশাহের এক ছাউনীতে ফয়জান উগ্‌লু আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর সঙ্গে

বসে আছে। মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীকে দ্বিতীয় ইমাম শামিল বলা হয়। ইমাম শামিল ছিলেন দাগিস্তানের বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি কয়েক যুগ রুশ অপশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং অনেক রণাঙ্গনে রুশ সেনাদেরকে ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজিত করেছিলেন। তারই মত সাহসী যোদ্ধা ও কমান্ডার হলেন মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেব। এ কারণেই তাকে দ্বিতীয় ইমাম শামিল বলা হয়। ফয়জান ও হক্কানীর সামনে একটি মানচিত্র ছড়ানো। তাঁদের সঙ্গে আরেকজন লোক বসে আছে। সে হচ্ছে আফগান সেনাবাহিনী থেকে পলাতক মেজর ওমর খান। এখন সে বীর মুজাহিদ। সে অস্থিরচিত্তে মাঝে-মধ্যে এপাশ-ওপাশ করে দিক পরিবর্তন করছে। মেজর ওমর মস্কোতে বিশেষভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সে বুঝতে পারছিল যে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আসন্ন হামলায় রুশ সেনাবাহিনীর এয়ারবোর্ন ডিভিশনের কমান্ডোরা অংশ নিতে যাচ্ছে। মুজাহিদদের মধ্যে ঈমানী জযবা ও আবেগের কোনই ঘাটতি নেই। তাদের ঘাটতি অস্ত্রের। যুদ্ধ শুধু জযবা দিয়ে জয় করা যায় না। তার সাথে প্রয়োজন হয় অস্ত্রের। এই অস্ত্রের স্বল্পতাই মেজর ওমর খানকে চিন্তিত করে তুলছে।

"ওমর খান! আমি জানি, তুমি কি ভাবছো এবং চিন্তা করছ!" মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী তার দিকে না তাকিয়েই বললেন।"

"ওমর খান! এটা আমাদের জন্য কোন নতুন ব্যাপার নয়। আমাদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র সব সময়ই কম ছিল এবং অনেক সময় আমরা নিরস্ত্রই ছিলাম। কিন্তু আমাদের জন্য আল্লাহ রয়েছেন। যিনি সর্বশক্তিমান, তারই ওপর আমাদের রয়েছে একান্ত ভরসা। সেই ভরসা ও ঈমানী শক্তির বলে আমরা রুশ ও তার সেবাদাস অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। ওমর খান! তুমি কিছু না বললেও আমি শত্রুদের আসন্ন আক্রমণের প্রচন্ডতা অনুমান করতে পারছি। আমাদের কাছে ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র না থাকারই মত। আমাদের কাছে শত্রুদের বিমান আক্রমণ রুখবার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র নেই। কিন্তু তবু আমাদের এ যুদ্ধে লড়তে হবে। শেষ

নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঝাওয়ার মারকাজকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ, ঝাওয়ার মারকাজের পতন ঘটলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আফগানিস্তানে লড়াইরত প্রতিটি মুজাহিদ জোয়ানের উপর পড়বে।"

"বস্, কমান্ডার সাহেব! বুঝে ফেলেছি। আর কিছু বলতে হবে না। এখন মনের মধ্যে অনেক প্রশান্তি বোধ করছি।" মেজর ওমর খান এ বলে দূর আকাশের পানে তাকালো।

তিনজনই দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের হামলা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে লাগলেন। তারপর একটি জীপে বসে ঝাওয়ার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

পরদিনই শত্রুরা আক্রমণ করে বসল।

।। ৪ ।।

হামলার সূচনা করল আফগান কমান্ডোরা!

অতি প্রত্যুষে আফগান কমান্ডোদেরকে অনেকগুলো হেলিকপ্টারের মাধ্যমে লিঝা পাহাড়ে নামিয়ে দেওয়া হল। তার সাথে সাথে ঝাওয়ার মারকাজের নিকটস্থ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়গুলোতে আফগান ও রুশ ছত্রী সেনারা পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ সব পাহাড়ে লড়াই করার জন্য যে সব কৌশলের প্রয়োজন হয়, শত্রুরা তার সবগুলোই অবলম্বন করল। ব্রিটিশরাও ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধকালে এখানকার বীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এসব পন্থা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সে যুদ্ধে তাদেরকে আফগানদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছিল। শত্রুরা হেলিকপ্টার দিয়ে ছত্রী সেনা নামিয়ে মুজাহিদীনের মাথার একেবারে শিয়রের কাছে নিজেদের কমান্ড পোষ্ট প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। এখন তারা এসব পাহাড়ী বাংকারগুলোকে কভার করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। মুজাহিদরাও বসে নেই। তাদের কাছে যে সব মামুলী ধরনের অস্ত্র আছে, তারা সেগুলো তাদের সাধ্যানুযায়ী ব্যবহার করল। এর

ফলে তারা রুশ নির্মিত ৮টি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করল এবং শত শত রুশ ও আফগান কমান্ডোকে গুলী করে ঝাঁঝরা করে ফেলল।

কিন্তু শত্রু পক্ষ তো প্রবল শক্তির সহায়তায় এই আক্রমণ পরিচালনা করছে। তারা সাধারণ ক্ষতি উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকল। মুজাহিদদেরকে কমান্ডোদের সঙ্গে মোকাবেলায় জড়িয়ে রেখে শত্রুদের আর্টিলারী বাহিনী তুরগার পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ধ্বংস তান্ডব চালিয়ে যেতে লাগল।

তার সাথে সাথে আফগান বিমান বাহিনীর দু স্কোয়াড্রোন আকাশ পথে অগ্নি বর্ষণ করে গেল। ভূমি ও আকাশ পথে এক যোগে শত্রুবাহিনী এত প্রচন্ড ও ধারাবাহিকভাবে বোম্বিং করে যাচ্ছে যে, কোন মুজাহিদের পক্ষে বাংকার থেকে মাথা উঠিয়ে আক্রমণ করার সুযোগ হল না।

আফগান গোলন্দায বাহিনী তাদের রুশ প্রভুর নেতৃত্বে এক এক ইঞ্চি ভূমির উপর অগ্নি বর্ষণ করছে। আকাশ থেকে আগুন ও লোহার সয়লাব মুজাহিদদের উপর বর্ষিত হতে লাগল। শত শত প্রশংসারযোগ্য আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাসী মুজাহিদগণ এই নমরূদের আগুনের তুফানের সামনে নিজেদের বক্ষ পেতে দিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত শত্রুদের ধ্বংসকারী বোমা বিস্ফোরণ অব্যাহত রইল, পরের দিন খুব ভোরে ভারী গোলন্দায বাহিনীর গোলা বর্ষণের ছত্র-ছায়ায় খোস্তে বিদ্যমান দুই ডিভিশন পদাতিক ফোর্সেস ঝাওয়ার মারকাজের দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

শত্রুর মোকাবেলায় মুজাহিদদের সংখ্যা আটার মধ্যে লবণের অনুপাতও নয়। ফয়জান উগ্‌লু মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর সঙ্গে “বাড়ী” মারকাজের একটি সুরক্ষিত বাংকারে মেশিনগান নিয়ে দন্ডায়মান। তাদের চোখের সামনে দিয়ে শত্রুদের সাঁজোয়াবাহিনী চলে গেল। কিন্তু এই হালকা অস্ত্র দিয়ে তাদের মোকাবেলা করা অসম্ভব। আবেগের তাড়নায় যারা এসব হেভী অস্ত্রের উপর গুলি বর্ষণ করল তাতে ঠন ঠন শব্দ করা ছাড়া আর কিছুই ক্ষতি হল না। তবে মুজাহিদদের হালকা অস্ত্রের গুলিতে পদাতিক বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি হল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত লিজা ও বাড়ী মারকাজে বিদ্যমান আনুমানিক সমস্ত মুজাহিদ হয়ত শাহাদাতবরণ করল, না হয় মারাত্মক আহত হল।

সামান্য আহত মুজাহিদরা নিজেদের মারাত্মক আহত সাথীদেরকে ঝাওয়ার মারকাজের দিকে স্থানান্তরিত করল। রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত বাড়ী মারকাজে ফয়জান উগ্‌লু, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং অন্য দু'জন আহত মুজাহিদ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই।

।। ৫ ।।

"ফয়জান! এখন মোকাবেলা নিস্ফল। আমাদেরকে ঝাওয়ার অভিমুখে পশ্চাদপসারণ করতে হবে।" মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, তাঁরই কাছে একজন আহত মুজাহিদের বাহুতে নিজের পাগড়ী চিড়ে পট্টি বেঁধে দিতে দিতে, ফয়জানকে লক্ষ্য করে বললেন।

ফয়জান ঘাড় ফিরিয়ে মাওলানা হাক্কানীর দিকে তাকাল। তার চোখে ক্রোধ ও নৈরাশ্যের ছাপ সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মাওলানা হাক্কানী বুঝতে পারলেন, ফয়জানের মন তার কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না।

কিন্তু, খোদ মাওলানাও তো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি চাচ্ছেন না যে, এত তাড়াতাড়ি তাদের এই মহান জানবায সঙ্গী শত্রুর হাতে প্রাণ হারাক। তাই তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "ফয়জান। বেটা আমার! আমি তোমার মনের আবেগকে ভাল করেই বুঝতে পারছি। আমি জানি, তুমি কি ভাবছ! কিন্তু, আমার স্নেহের ধন! আমি তোমাকে ধ্বংস হতে দেব না। জানি না, এ যুদ্ধ কত দীর্ঘায়িত হবে। আমাদের এখনো তো অনেক লড়তে হবে। আমার কাছে কিছু রিজার্ভ ফোর্সও তো রাখতে হবে। বেটা আমার! ওঠ, কথা মান।"

"ইয়া আমীর! আমার মনটা কোনভাবেই পশ্চাদপসারণকে মেনে নিতে পারছে না।" ফয়জান এছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

"না বেটা! এটা যুদ্ধেরই একটি কৌশল। মুসলমানরা জেহাদের

ময়দানে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। আমরা পিছপা হচ্ছি যুদ্ধে আবার ফিরে আসার জন্য। খোদায়ে ওয়াহদাহু লা-শরীক-এর শপথ! যদি আমাদের ধমনীতে আফগান মর্দে মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্, আমরা ঝাওয়ার মারকাজের উপর বেশী দিন শত্রুদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দেব না।"

।। ৬ ।।

তিনজন রাতের আঁধারে বাড়ী মারকাজ থেকে ঝাওয়ারের দিকে পিছু হটতে লাগলেন। ঝাওয়ারের পরিস্থিতিও ব্যতিক্রম নয়। শত্রুদের শত শত লাশের মাঝে তারা মুজাহিদদের শহীদী লাশও দেখতে পেলেন। মনে হয় এক একজন করে সমস্ত মুজাহিদ আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেদের হাজিরা দিয়েছেন। তারা বেদনাভরা দৃষ্টিতে ঝাওয়ার মারকাজের দিকে তাকালেন। এরপর মিরানশাহ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সবদিকেই শত্রুদের কড়া বেষ্টনী এবং সতর্ক নজরদারী। কিন্তু তবু এ তিনজন আল্লাহর সৈনিক কোন না কোনভাবে প্রভাত হওয়ার আগেই মিরানশাহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তাদের আগমনের পূর্বেই বেশ কিছু আহত মুজাহিদ এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাদের মুখ থেকে তথ্য পাওয়া গেল যে, দু-তিনটি বাংকার ছাড়া বাকী সব জায়গাতে মুজাহিদদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মুজাহিদগণ হয়ত শহীদ হয়েছেন না হয় আহত হয়ে সেখান থেকে পালিয়েছেন।

সকাল আটটার দিকে মিরানশাহে অবস্থিত মুজাহিদদের একটি অফিসে সমস্ত রণাঙ্গনের কমান্ডারগণ একত্রিত হলেন, তারা সকলে মিলে কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করতে লাগলেন। যোহর নামাজের আগ পর্যন্ত তারা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সে দিনই মাগরিবের পর আট হাজার মুজাহিদ মিরানশাহে মুজাহিদ কেন্দ্রে একত্র হলেন। আসন্ন অভিযানের জন্য চারজন কমান্ডার নির্দিষ্ট করা হয় ঃ

১। মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী

২। ফয়জান উগ্‌লু জালালাবাদী

৩। আরসালান খান রাহমানী

৪। আরব মুজাহিদ মুহাম্মাদ আবু হাফস

সকলের সিপাহ্‌সালার নিয়োগ করা হয় মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবকে। এরপর মুজাহিদরা বেদ্বীন মুরতাদ সৈন্যদের জন্য মৃত্যুর দূত হয়ে চতুর্দিক থেকে ঝাওয়ার মারকাজের উপর হামলা করলেন। শত্রুরা গোয়েন্দা মারফত পূর্বেই জানতে পেরেছিল যে, ঝাওয়ার মারকাজ পুনরুদ্ধারের জন্য পাক সীমান্তবর্তী অঞ্চল মিরানশাহে মুজাহিদ বাহিনী ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। এতবড় সমাবেশ তাদের কোন সময় ঘটেনি। এ সংবাদ শুনে রুশ ও আফগান সৈন্যদের মধ্যে ভীষন আতংক ছড়িয়ে পড়ে। যেই মাত্র তারা দেখতে পেল যে, মুজাহিদরা অত্যন্ত সুসংহত হয়ে ঝাওয়ার মারকাজ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে তারা ভারী অস্ত্র-সস্ত্র রেখে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে যেসব মুজাহিদ পূর্বে আহত অবস্থায় বিভিন্ন পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল তারা মুজাহিদ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের কথা শুনে আবার লিজা ও বাড়ী পৌঁছতে শুরু করল এবং সে দিক থেকে রুশ ও আফগান সৈন্যদের পালানোর পথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে শত্রুরা বিপদজ্জনকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। তারা তো মুজাহিদদের ব্যাপক সমাবেশের কথা শুনেই হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিল। এখন যখন বুঝতে পারল যে, তাদেরকে মুজাহিদরা ঘেরাও করে ফেলেছে। এখন তারা তাদের শেষ সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলল। তাদের নিশানা বেশীর ভাগ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। মুজাহিদরা সহজ টার্গেট মনে করে শত্রুদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দুপুর পর্যন্ত মুজাহিদরা পুণরায় ঝাওয়ার মারকাজ সহ খোস্ত গ্যারিসন পর্যন্ত দখল করে নেন। এ যুদ্ধে প্রায় ৭ হাজার রুশ ও সরকারী সেনা নিহত হয় এবং দুহাজার সৈন্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মাত্র ৭০ জন মুজাহিদ শাহীদ হন।

❖ ❖ ❖

সেই উপকারী পথপ্রদর্শক

নানগারহার থেকে পাড়াচিনার অভিমুখে যে সড়কটি চলে গেছে, সেই সড়কের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছেন দুজন মুজাহিদ। এ সড়কটিতে মুজাহিদরা সাধারণত অত্যন্ত চৌকস হয়ে পাহারা দেন। কারণ, এ পথ দিয়েই মোহাজিরদের ধ্বংস-বিধ্বস্ত কাফেলা পাকিস্তানে প্রবেশ করে।

ফয়জান স্বয়ং নিজের চোখে দূরবীন লাগিয়ে রিক্তহস্ত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অথচ লাল-সাদা-মিশ্রিত দৃঢ়তার প্রতীক ঈমানী নূরে উদ্ভাসিত চেহারার মালিক আফগানদেরকে দেখছে। তাদের শরীরে পুরনো ছিন্ন বস্ত্র। প্রচণ্ড শীতে কম্পমান দেহ নিয়ে তারা নিজেদের ঘর, বাস্তু-ভিটা ছেড়ে প্রতিবেশী মুসলমান দেশে হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন।

তাদের দেখে ফয়জান উগ্‌লুর মানস পটে ভেসে উঠল চৌদ্দশ বছর আগের দৃশ্য। সে কল্পনার চোখ দিয়ে সে সব পবিত্র আত্মা মহা মনিষীদেরকে দেখতে পাচ্ছে, যাদের জন্য মক্কার ভূমি এজন্য অসহনীয় করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহপাকের খাঁটি সত্য ও চিরশাশ্বত ধর্মকে গ্রহণ করে এ ধর্মের আনয়নকারী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর আহবানে লাব্বাইক বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেসব লোকও ছিলেন যাঁরা নিজ নিজ গোত্রের সরদার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন

লোকও ছিলেন যাঁদের ভয়ে কখনো মক্কার অলি-গলি প্রকম্পিত হত। যাঁদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির সামনে কোন মানুষের দৃষ্টি নত না হয়ে থাকতে পারত না।

আজ তাঁরা সবাই নিজেদের নেতৃত্ব, মান-সম্মান, গৌরব, প্রতিপত্তি সব কিছু ত্যাগ করে রাহমাতুল্‌লিল্‌ আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করছিলেন। তাঁরা আত্মীয়তার বন্ধন, মাতৃভূমির মায়া সবই বিসর্জন দিচ্ছিলেন শুধু দ্বীনের খাতিরে।

ইতিহাসের আরেকটি পাতার প্রতি ফয়জানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। হযরত আবু জান্দাল (রাযিঃ)-এর অধ্যায়ের উপর তার নজর স্থির হয়ে এলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি তখনো লেখা আরম্ভ হয়নি, হযরত আবু জান্দাল (রাযিঃ)-হুজুর (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তার পায়ে বেড়ী লাগানো, শিকল দিয়ে বাঁধা। তিনি অনেক কষ্ট করে, চলতে পারেন না, তবু উঠে পড়ে কোন মতে সেখানে পৌঁছলেন। আবু জান্দাল কান্না জড়িত কণ্ঠে ফরিয়াদ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে দেখুন আমার পিঠখানা, এখনো চাবুক কষার চিহ্ন একেবারে তাজা। বিভিন্ন জায়গা ফেঁটে টাটকা রক্ত ঝরছে। আমার বুকে জ্বলন্ত পাথর দিয়ে ছ্যাকা দেয়া হয়েছে।

আমার পিঠকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে টেনে টেনে হেঁচড়ানো হয়েছে। মক্কার কাফেররা আমার উপর সম্ভাব্য সব ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। আমার অপরাধ কি? আমার অপরাধ শুধু এটুকু যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি–কালেমায়ে শাহাদাত পড়েছি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মক্কার কাফেররা বলে যে, তুমি মুহাম্মাদ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা কর। তা না হলে তোমাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু আমি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, ও জালেম, মুর্খ হায়েনারা! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহব্বত, আনুগত্য ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার কারণে তোমরা যদি এমন নির্যাতন চালিয়ে

যাও, তাহলে মনে রেখো, আমার এক প্রাণ কেন, হাজারো প্রাণ যদি থাকে তবু তার উপর কোরবানী করব। তোমরা আমার শরীরের প্রতিটি জোড়াকে পৃথক করে দাও। প্রতিটি অঙ্গকে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে ছ্যাকা দাও। তোমাদের চাবুকাঘাতে আমি রক্তে ভেসে যাই; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত অবশিষ্ট থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে ছিন্ন না হবে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেই যাব!" আবু জান্দাল অতি কষ্টে বেড়ী ও শিকল সহ এখান পর্যন্ত পালিয়ে এসেছেন। তার করুণ কাহিনী শুনে সবার চোখে অশ্রু দেখা দেয়। সকলের হৃদয় ছিল তার জন্য ব্যথিত। তবু চুক্তির খাতিরে হুজুর (সঃ) তাঁকে আশ্রয় দিতে পারলেন না। তাঁকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। হুজুর (সঃ) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন এবং এই সুখবর শুনালেন, "হে আবু জান্দাল! অতি সত্বর আল্লাহ তোমার জন্য পথ খুলে দেবেন।"

ফয়জানের কল্পনার চক্ষু আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টাল। সে দেখতে পেল, সেই মজলুম, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষগুলো যাদেরকে নিজেদের ঘর, বসতভিটা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সে সব সত্যের পতাকাবাহী সাহাবায়ে কিরাম (রিযওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈন) মহানবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে সারিবদ্ধ হয়ে সেই মক্কাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, যার জমিনকে তাদের জন্য অসহনীয় করে দেয়া হয়েছিল।

মক্কার সেসব অলি-গলি, যেখানকার বাড়িঘরের জানালা ও দরজা থেকে মুসলমানদের উপর ইট পাথর ও গালি বর্ষন করা হতো, আজ সে সব কিছুই তাঁদের প্রতাপ ও শক্তির সামনে ছিল অবদমিত। যে সব মানুষকে একদা এখানে মাথা নিচু করে চলতে হত, আজ তাঁরা বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করছেন; কিন্তু বিজয়গর্বে এখনও তাঁদের গর্দান উদ্ধত নয়, আল্লাহর ভয়ে তাঁদের মস্তক অবনত। নম্রতা, ভদ্রতা তাদের প্রতিটি আচরণ থেকে উদ্ভাসিত।

মর্মপীড়ায় তো তারাই ভুগছিল যাদের অহমিকায় ভরা উদ্ধত

গর্দানগুলো অবনত হয়ে পড়েছিল। যারা মুসলমানদেরকে তাঁদেরই ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। যারা তাঁদের উপর জুলুম ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। তাঁদেরকে আরবের উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে টেনে হিঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ছিল, তাঁদেরকে পাহাড়ের ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত শরীরের উপর দিয়ে অশ্ব চালিয়ে দিয়েছিল। সেই সব জালিম, হিংসা পরায়ণ কুরাইশের নেতারা ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজ-নিজ গৃহে কাপুরুষের মত দরজা বন্ধ করে চুপ মেরে বসেছিল।

মোকাবেলা দূরে থাক, আল্লাহর সৈনিকদের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখারও কারোর সাহস হচ্ছিল না।

কুরাইশের বীরত্বের বাহু আজ অবশ হয়ে পড়েছে। তাদের পৌরুষত্ব বিবশ ও স্খলিত হয়ে পড়েছে।

তাদের সেই পৈতৃক মর্যাদাবোধ ও অহংকারের উপর কুয়াশা পড়ে গিয়েছে। তরবারীতে মরচে পড়ে গিয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর খায়েফ নামক স্থানে মহানবী (সঃ) সর্বপ্রথম অবস্থান করেন। এ স্থানটিকে 'শুআবে আবী তালেব'ও বলে। এ স্থানটিতেই আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে মক্কার কাফেররা মুসলমান ও তাদের সমর্থক বনু হাশেমদেরকে দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিল। তাদেরকে বয়কট করে রেখেছিল। এমনকি পানাহারের কোন বস্তু তাদের কাছে পৌঁছতে দিত না। ফলে তারা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত গাছের পাতা ও শিকড় খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গতকালের অবরুদ্ধরা আজ বিজয়ী!

গতকালের জালিমরা আজ তাদেরই হাতে নিপীড়িত এবং বঞ্চিতদের কাছে করুণার ভিখারী। তাদের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। আজ সেই মজলুম লোকদের কাছে আশ্রয়ের জন্য, জীবনের নিরাপত্তার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করছিল, আবেদন-নিবেদন করছে।

সত্য সমাগত হয়েছে এবং মিথ্যার মরণ ঘন্টা বেজে গিয়েছে।

।। ২ ।।

ফয়জান এ সবই ভাবছে!

সে ভাবছে, তাহলে কি সত্যের বিজয়ের জন্য এসব স্তর অতিক্রম করতে হবে? মুসীবত, পরীক্ষা ও কোরবানীর মুখোমুখী হতে হবে? তখন তার কুরআনুল কারীমের সেই আয়াতগুলো মনে পড়ল যাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, আহাছিবান্নাছু আঁঈ ইউত্‌রাকূ আঈ-য়াকূলূ আ-মান্না ওয়াহুম লা-ইউফ্‌তানূন। ওয়ালাক্বাদ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন্‌ ক্বাব্‌লিহিম ফাল্‌ইয়া'লামান্নাল্লা হুল্লাযীনা ছদাকূ ওয়ালাইয়া'লামান্নাল কা-যিবীন"। অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" (আল-আনকাবুত)

অতীতের মধ্যে ভ্রমণ করে ফয়জান উগ্‌লু বর্তমানের তিক্ত বাস্তবতায় ফিরে এল। হঠাৎ তার দূরবীনটি আল্লাহর রাস্তায় সফরকারী একজন বৃদ্ধ মুসাফিরের উপর ফোকাস করল এবং সে স্থির হয়ে গেল!

"ও আমার খোদা! ইনি তো সেই লোক!" সে বিড়বিড় করলো।

বাস্তবেও তিনি ছিলেন সেই লোক।

সেই বৃদ্ধ চিত্রকর ! যিনি তার জীবনের ছবিতে খুবই গাঢ় রং লাগিয়েছিলেন। যিনি তাকে মরার পরিবর্তে জীবিত থাকার পথ দেখিয়েছিলেন। যিনি তাকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন তার মহান অনুগ্রহকারী, যিনি দিয়েছিলেন তাকে সত্যপথের দিশা। ফয়জান আপসে তার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। এরপর পাগলের মত তার পা দুটি সেই কাফেলার দিকে তাকে দ্রুত নিয়ে গেল, যাদের সঙ্গে তার সেই অনুগ্রহকারী মানুষটি আসছিলেন।

পাহাড়ে তৈরী বাংকারগুলোতে মুজাহিদরা সম্ভাব্য যে কোন স্থল ও আকাশ পথে এ কাফেলাকে শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য চৌকসভাবে পাহারা দিচ্ছিলেন। কারণ তারা জানেন যে, কাপুরুষ শত্রুরা এসব অসহায়, নিরস্ত্র মজলুম মোহাজিরদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও ভূমি থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা সীমান্ত পার হয়ে যায়।

মুজাহিদদের অধীন এলাকায় পা রাখতেই আল্লাহর সৈনিকরা নিজেদের অস্ত্রের ছত্র-ছায়ায় এসব মজলূমানকে হেফাজত করেন।

।। ৩ ।।

ফয়জানকে হঠাৎ করে পাগলের মত দৌড়াতে দেখে তার তিনজন সঙ্গীও তার পিছে ছুটল। কমান্ডার ফয়জানকে আকস্মিক এ ভাবে দৌড় লাগাতে দেখে তারা সত্যিই হতভম্ব হয়ে পড়ল। তার দৃষ্টি নিজের সেই বৃদ্ধ অনুগ্রহকারীর অভিমুখে। সে বৃদ্ধ চিত্রকরের কাছে পৌঁছে থেমে গেল। মোহাজির কাফেলার দৃষ্টি তার দিকে উঠে এলো।

"আমার বুজুর্গ, আমার মুরুব্বী!" খুব কষ্টে ফয়জানের মুখ থেকে বের হল।

"আমার বেটা!" বুড়ো চিত্রকরও তাকে চিনতে পেরে নিজের বাহু দুখানা প্রসারিত করে ফয়জানকে স্নেহের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। ফয়জানও দীর্ঘক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল। তার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। চোখে আনন্দাশ্রু। জানি না এই বৃদ্ধ চিত্রকরের কাছে এমন কি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে যে, ফয়জান যখনই তার সামনে আসে, মোমের মত গলে যায়।

"কেমন আছেন আপনি?" আপনা আপনি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"বেটা আমার কথা ছাড়ো! আমার সফর তো সমাপ্তির পথে। আল্লাহ পাকের অনেক অনেক শুকর যে, আমি সফলতা নিয়ে দুনিয়া

থেকে বিদায় নিচ্ছি। জিহাদের ময়দানে তোমার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের সংবাদ আমি পেয়েই যেতাম। তোমার জন্য আমার মুখ থেকে দোয়া বেরিয়ে আসত।”

“আসুন! আমার সঙ্গে আসুন।” ফয়জান তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল। সে অনুভব করতে পারল, তার রাহ্‌বার আর বেশীক্ষণ নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না।

“না, না, আমি নিজে নিজেই চলে যেতে পারব।” বুড়ো চিত্রকর এতটুকু বলে খুব কষ্টে এক কদম আগে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ করে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ফয়জান ও তার অন্য মুজাহিদ সাথীটি যদি তাকে সঙ্গে সঙ্গে না ধরত, তবে তিনি নিঃসন্দেহে পড়ে যেতেন।

‘চাচা মুহাম্মদ গুল! বাদ দিন। আপনি আর চলতে পারবেন না। আপনার যখম বিগড়ে গেছে।” কেউ পিছন থেকে বুড়োর নাম নিয়ে ডাকলে ফয়জান সেদিকে তাকাল।

প্রশস্ত ললাট ও গভীর চোখের একজন যুবকের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হল, যে বৃদ্ধের নাম নিয়ে ডেকেছিল। কোন কিছু জিজ্ঞাসার পূর্বেই সে ফয়জানের নিকট পৌঁছে গেল।

“চাচা মুহাম্মাদ গুলের উপর অনেক নির্যাতন হয়েছে। তিনি অনেক কষ্টে তাদের মরণ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমরা দেশীয় পদ্ধতিতে যতটুকু সম্ভব তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করেছি। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাঁর অবস্থা খুবই গুরুতর। তাড়াতাড়ি করো। আমি মেডিক্যালের ছাত্র, আমি তাঁর অবস্থা ভাল করেই বুঝি, জলদি করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর ডাক্তারী চিকিৎসা হওয়া উচিত।” নওজোয়ানটি এলোমেলোভাবে বলে গেল।

ফয়জানের মনে হল কেউ যেন আকস্মিকভাবে তার অন্তরের উপর শক্তিশালী ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে! সে বৃদ্ধকে নিজের কাঁধে ওঠাল এবং পাথর ও কংকরময় পথগুলো দৌড়ে দৌড়ে পার হতে লাগল। তার গন্তব্য সেই আশ্রয়স্থল, যেখানে মুজাহিদরা ইমারজেন্সী চিকিৎসা কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছেন।

।। ৪ ।।

এ এলাকায় মুজাহিদরা কিছু দিন হল অবস্থান নিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে বাংকার খনন করে এলাকাকে সামরিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত করার কাজে তারা লেগে রয়েছেন। ফয়জান ছাড়াও বিভিন্ন গ্রুপের মুজাহিদরা এখানে অবস্থান করছিলেন। যেইমাত্র ফয়জান তার বৃদ্ধ পথপ্রদর্শককে কাঁধে ওঠিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছল, সেখানে বিদ্যমান অনেক বৃদ্ধ ও যুবক মুজাহিদীন তাদেরকে ঘিরে ধরলেন।

"আরে এতো মুহাম্মাদ গুল!"

"আর ইনিতো চাচা মুহাম্মদ গুল!

"মনে হচ্ছে, গুরুতর আহত।"

"চাচা মুহাম্মদ গুল! ভাল আছেন তো?"

অনেকগুলি পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে আসল। মুহাম্মদ গুল কোন উত্তর দিলেন না। শুধু ঈষৎ হাসি সর্বক্ষণ তাঁর ওষ্ঠদ্বয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রইল।

ফয়জান চিকিৎসা কেন্দ্রে বিদ্যমান একটি স্ট্রেচারে তাঁকে শুইয়ে দিল। মোহাজিরদের সঙ্গে আগত সেই মেডিক্যালের ছাত্রটিও ফয়জানের পিছনে পিছনে আসছিল।

"আমাকেও দেখতে দাও! আমি তার অবস্থাটি ভাল বুঝব।" যুবকটি স্ট্রেচারের কাছে দু'জন অবসাদ-ক্লান্ত ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলল। তারা কয়েক মিনিট পূর্বে জিহাদের ময়দানে আহত একজন মুজাহিদের যখমে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে সেখানে এসে বসেছিল। যুবক সোজা মুহাম্মদ গুলের কাছে এল।

"তার পেটের যখমটি অত্যন্ত গুরুতর।" যুবকটি খাটিয়ায় শোয়া মুহাম্মদ গুলের পেটে পেঁচানো একটা ময়লা কাপড় সরিয়ে নিয়ে বলল।

ডাক্তার দু'জনেই সে দিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করল।

"মনে হয় ইনফেকশন হয়ে গেছে।" তিনজনই একে অপরের দিকে শংকিত দৃষ্টিতে তাকাল।

"আচ্ছা আমাকে একটু ভাল করে দেখতে দাও তো।" তাদের মধ্য যিনি সবচেয়ে সিনিয়র তিনি বললেন।

তিনি ক্ষত স্থানটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ফয়জান ও তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা সবাই একটু বাইরে যাও।"

"ডাক্তার সাহেব! আমি–?" ফয়জান কিছু বলতে চাইল।

"না; যাও, এখখুনি বাইরে যাও। দেরী করো না।"

ডাক্তার চাচ্ছেন না কেউ তার কাছে থাকুক।

ফয়জান একবার তার রাহবারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। এরপর দ্রুত বাইরে চলে এল। আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য এই রুমটি পাহাড় কেটে বানানো হয়েছিল। সেখানে একটি দরজাও লাগানো রয়েছে। তারা সবাই বাইরে বেরিয়ে গেলে ডাক্তার সাহেব দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখানকার ডাক্তাররাও সকলেই মুজাহিদ। তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে এসেছেন। আফগানিস্তানের জিহাদে অংশ নেওয়ার জন্য তারা এখানে এসেছেন। চিকিৎসার অসম্পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম ও সামান্য কিছু ওষুধ-পত্র দিয়ে রাত দিন মুজাহিদদের জীবন রক্ষার জন্য, জীবনের প্রতি হুমকি নিয়েও তারা এ খেদমতে ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময় দেখা গেছে, এক একদিনে ডজন ডজন আহত মুজাহিদকে এখানে আনা হচ্ছে। তাদেরকে মাত্র একজন কিংবা দুজন ডাক্তার কোন সহযোগী ছাড়াই চিকিৎসা করছেন। অজ্ঞান করার ওষুধ ছাড়াই অপারেশন করতে হয়।

।। ৫ ।।

চিকিৎসা কেন্দ্রের দরজাটি প্রায় আধা ঘন্টা পর খুলে গেল। এই আধা ঘন্টা ফয়জানের জন্য কয়েক শতাব্দী বলে মনে হল। এ সময়ের মধ্যে সে যে কী ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। বাইরে আসা ডাক্তারের প্রতি আপসে তার দৃষ্টি পড়ল।

"দোয়া কর।" ডাক্তার সাহেব ফয়জানের দিকে না তাকিয়েই বললেন। তিনি হাত ধৌত করার জন্য কাছেরই একটি ঝর্ণার দিকে যাচ্ছিলেন।

"আমি কি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি?" ফয়জানের কথা শুনে ডাক্তার থেমে গেলেন। তিনি খুব অবাক দৃষ্টিতে ফয়জানের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"কমান্ডার ফয়জান! তোমার সঙ্গে কি তাঁর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে?"

"ডাক্তার সাহেব! আমি তোমাকে এটা বুঝাতে পারব না।" মনে হল ফয়জানের শব্দগুলো দূর শূন্যে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে।

"আচ্ছা, তুমি রোগীর কাছে যেতে পার।" বলে ডাক্তার ঝর্ণা পারে চলে গেলেন।

।। ৬ ।।

মুহাম্মদ গুল কামরায় পাতানো লোহার পালঙ্গে শুয়া আছেন। দৃশ্যতঃ দেখে মনে হচ্ছে যে, তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি ঠিক আছে। তাঁকে শান্ত মনে হল। ফয়জানকে ভিতরে আসতে দেখে তিনি ওঠে বসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর শিয়রে দাঁড়ানো কাফেলার সাথে আগত সেই মেডিক্যাল স্টুডেন্টটি তাঁকে ওঠতে বারণ করল।

"বাবা! আপনি এত দীর্ঘ দিন কোথায় ছিলেন? আপনাকে তো আমি অনেক খুঁজেছি।" ফয়জান অসংকোচে কথাগুলো বলল।

"বেটা! আমি আমার ডিউটি পালন করছিলাম। যেমন তুমি নিজের কাজ করছ। আমি সেখানে কাবুলে কাজ করছিলাম। একদিন আমার কোন চাল চলনে খাদ এবং কেজিবি'র লোকদের সন্দেহ হয়। ফলে আমাকে তারা গ্রেফতার করে।" এটুকু বলতে হঠাৎ প্রচন্ড ব্যথা ওঠল, যার কারণে বৃদ্ধ আধমরা হয়ে গেল।

ফয়জান অস্থির হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

"না......কিছু না....বস। তুমি ওখানেই থাক...... কেউ-ই আমার কাছে এসো না.....আমাকে আমার কথা শেষ করতে দাও..... ।" তিনি থেমে থেমে কামরার ভেতরে দু'জনকেই নিজের নির্দেশ শুনালেন।

ফয়জানের সাহস হল না যে, তাঁর কথা কেটে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবে।

"তারা আমার উপর সম্ভাব্য সব ধরনের নির্যাতন চালাল। কিন্তু আমি তাদের সামনে কিছুই ফাঁস করলাম না। আমি বারবার বলছিলাম যে, তাদের সন্দেহ ভুল, অহেতুক ও ভিত্তিহীন। কেউ শত্রুতাবশত তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র করছে।" খানিকের জন্য থেমে তিনি নিজের বিক্ষিপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসকে ঠিক করতে লাগলেন।

"মূলতঃ আমি চাচ্ছিলাম, কোন মতে যদি সেই ভিতরের গাদ্দারটা কে জানতে পেতাম, যে আমার গোপনীয়তা শত্রুদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।"

দু মাস পর্যন্ত ভীষন নির্যাতন করার পরও তারা আমার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারল না। তখন তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তাদের গুপ্তচরের তথ্য ভুল, কিংবা সে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে আমাকে মুজাহিদদের সাথে জড়িয়ে দিয়েছে।"

"আমাকে এক ঢোক পানি দাও!" তিনি থেমে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলেন। দেখে মনে হল যেন তিনি কোন দীর্ঘ ভ্রমণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এখন তিনি বিশ্রাম নিতে চাচ্ছেন।

"এরপর আমি এক সময় জানতে পারলাম, সেই বগলের সাপটি কে। কে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। আমি সেই নরাধমকে হত্যা করলাম, যে আমার বন্ধু সেজেছিল। মুজাহিদদের হিতাংকখী সেজে আমার ও মুজাহিদদের খবরাখবর শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দিত। আমি সেই গাদ্দারকে জাহান্নামে পৌঁছে দিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে, আমার নজরদারী চলছে। আমি তাকে হত্যা করার পর

পালাতে গিয়ে তারই নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীর গুলীতে মারাত্মকভাবে আহত হই। তবে যেহেতু অন্ধকার ছিল, তাই প্রাণে বেঁচে যাই। তা না হলে হয়ত এ জীবনে আর কখনো তোমাদের সঙ্গে দেখা হত না।" এ বলে তিনি ফয়জানের দিকে তাকালেন। ফয়জান অস্থির হয়ে ওঠল।

"এ যুবকটিই আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আমার আশা ছিল না যে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারব। তুমি এখখুনি একটি কাজ কর।"

"কি কাজ?" আপনা আপনি ফয়জানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"কাসেম ঈশানজাদাকে যেকোন উপায়ে হোক, এখানে নিয়ে এস....।" তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন।

"কাসেমকে......আচ্ছা.....আচ্ছা.........ঠিক আছে, আপনি আমার অপেক্ষা করুন। আমি এখ্খুনি তাকে ডেকে নিয়ে আসছি।" বলে ফয়জান ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

।। ৭ ।।

বাইরে এসে ফয়জান অনুভব করতে পারল যে, সে পরপারের যাত্রী মানে তার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে অবাস্তব কথা বলেছে। সে কাসেম ঈশানজাদাকে এখানে এত তাড়াতাড়ি কীভাবে আনবে! সে তো এখান থেকে পনের বিশ মাইল দূরে একটা গোপন আস্তানায় আছে, যেখানে পৌঁছতে হলে তাকে শত্রুদের এলাকা পেরিয়ে যেতে হবে।

"যে কোন প্রকারে হোক, আমি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী মানুষটির শেষ ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করব।" সে নিজেকে শোনাল।

ফয়জান পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়ে মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর কাছে পৌঁছল। হাক্কানী এ অঞ্চলের মুজাহিদ প্রধান। সে যখন তাকে জানাল যে, সে কোন এক মৃত্যুপথযাত্রী মুজাহিদের শেষ ইচ্ছার সম্মানার্থে কাসেম ঈশানজাদাকে ডেকে

আনতে যাচ্ছে, তখন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফয়জানকে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। ঐ অঞ্চলে দু'দিন আগে রাশানরা আফগান সেনাদের সঙ্গে মিলে বাংকার বানিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এমনিতেও সেটা ফ্রন্ট লাইন। কিছুকাল ধরে এখানে চলছে দুপক্ষের মধ্যে জীবন-মরণ লড়াই।

সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে গাঢ় হতে চলল। পাহাড় থেকে ভেসে আসল বারুদ ও বোমা বিস্ফোরণের তামাটে গন্ধ। ফয়জান নিজের বাংকার থেকে বের হল। পাহাড়ের দীর্ঘ চক্কর কেটে ও তুলনামূলক নিরাপদ রাস্তা ধরল। মুজাহিদরা অধিকাংশ রাতে শত্রুদের উপর চোরাগুপ্তা আক্রমণের জন্য এপথ দিয়েই যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু আজ ফয়জান উগ্‌লুর টার্গেট অনেক বিপজ্জনক।

সেই পথে বিছানো রয়েছে মানব বিধ্বংসী মাইন; তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কোন মতে মুজাহিদদের সেই গোপন ঘাঁটিতে সে পৌঁছতে সক্ষম হল, যেখানে বৃদ্ধ কাসেম ঈশানজাদা মুজাহিদদের কমান্ড করছিলেন।

ফয়জানকে এভাবে হঠাৎ করে এত রাতে সেখানে দেখে তিনি চমকিত না হয়ে পারলেন না। যখন সে তার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাসেম ঈশানজাদাকে বলল, তখন তার চেহারাখানা আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। নিজের পুরনো সঙ্গী মুহাম্মাদগুলের নাম শুনে তার মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ল। ফয়জান তার মনের আবেগ ভাল করেই অনুভব করল।

"আমি অবশ্যই যাব, এখ্‌খুনি প্রস্তুত হচ্ছি।" তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন।

ফয়জান এসেছে মাত্র পনের-বিশ মিনিট হয়েছে, কিন্তু কমান্ডার ঈশানজাদা এখ্‌খনি প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ ঈশানজাদা ক্লাশিনকোভের ম্যাগাজিন ভরে নিলেন। এখানকার জন্য একজন সহকারী কমান্ডার নিয়োগ করে ক্লাশিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি রওনা হলেন। তিনজন মুজাহিদের একটি ক্ষুদ্র দল তাদের চার মাইল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। এরপর ফয়জান উগ্‌লু জোরপূর্বক

তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। সে জানে যে, এই মাহাযে (রণক্ষেত্রে) এসব লোকদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। তাদের স্বল্পতা এখানকার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উভয়ে একজন আরেকজনের পিছনে পিছনে আসছে। রাতের অন্ধকারের কারণে তাদের সফরটি নিরাপদেই হচ্ছিল। কখনো কাসেম আগে চললেন, আবার কখনো পিছনে। এভাবেই সফর চলল। উভয়ে একজন আরেকজন থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলল, যাতে ঘটনাক্রমে যদি কোন একজনের পা মাইনের উপর পড়ে এবং সে কারণে মাইন বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে যেন অপরজনের প্রাণহানি না ঘটে; বরং ক্ষতিটা একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফয়জান এখন আগে আগে চলছে। হঠাৎ সে তার কাঁধের উপর কাসেম ঈশানজাদার হাতের চাপ অনুভব করল। ফয়জান থমকে দাঁড়াল। কাসেম কাছে এসে তার কানে কানে কিছু বললেন। তিনি কাছেই কোথাও পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। পাহাড়ী লোকেরা এসব পাহাড়ে সামান্য নড়াচড়া হলে সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যান। যেহেতু তারা এ পরিবেশেই লালিত পালিত হয়েছেন।

ফয়জান তার ইশারা পেয়ে নিজের কানটিও সেদিকে লাগিয়ে রাখল। তারা দু'জনেই বুঝতে পারলেন যে, তাদের খুব কাছেই কোথাও রুশ-আফগান ফোর্সদের কোন পেট্রোলিং পার্টি টহল দিচ্ছে। এসব লোক রাতের বেলায় সাধারণত মুজাহিদদের আকস্মিক চোরাগুপ্তা হামলাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য টহল দিতে থাকে, যাতে তাদের বাকী সঙ্গীদেরকে মুজাহিদদের নৈশ হামলার ধ্বংস-তান্ডব থেকে রক্ষা করতে পারে।

উভয়ে একটি পাহাড়ী খাদের আঁড়ালে যেখানে ঘন লম্বা লম্বা ছন-ঘাস ছিল, চুপটি মেরে বসে পড়লেন। পায়ের শব্দ আরো কাছে শোনা যাচ্ছে। তাতে পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, পেট্রোলিং-পার্টি তাদের খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

এখানে নিরাপদ রাস্তা খুব কমই। সাধারণ রাস্তায় মুজাহিদ ও শত্রু উভয়ই নিজ নিজ সুবিধার জন্য মাইন বিছিয়ে রেখেছে। যে

পথটি দিয়ে তারা সফর করেছে এপথটি নিরাপদ বিধায় শত্রু-সেনাদের পেট্রোলিং বাহিনীও সেই পথ অবলম্বন করেছে।

।। ৮ ।।

দু'জনেই রুদ্ধশ্বাসে বসে আছেন!

তারা ক্লাশিনকোভও প্রস্তুত পজিশনে রেখেছেন।

হঠাৎ একটি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে এখনো শেষ হয়নি, অমনি গুলীর তর্‌র-তর্‌র শব্দে পাহাড়-পর্বত মুখরিত হয়ে ওঠল।

মনে হচ্ছে, টহলরত কোন সৈন্যের পা মাইনের উপর পড়ে তা বিস্ফোরিত হয়েছে। শত্রুরা এটাকে মুজাহিদদের হামলা ভেবে জেনে-শুনে সতকর্তামূলক গুলী বর্ষন শুরু করে দিয়েছে। এ এলাকাতে এমনিও মুজাহিদরা অধিকাংশ সময় চোরাগুপ্তা হামলা চালায়। রাশান ফৌজরা তাদের সামান্য শব্দ পেলেই তোপ ও রাইফেলের মুখ খুলে দেয়। কারণ, তাদের মন-মানসিকতায় মুজাহিদ-ভীতি এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছে যে, তারা এমন করতে বাধ্য। এছাড়া তাদের অস্ত্র ও গোলা-বারুদের কোন ঘাটতি নেই।

।। ৯ ।।

দুজনেই ভাবলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের উত্তর দেয়া না হয়, তাহলে এই বিপদ এমনি এমনি কেটে যাবে। কারণ, তাদের কাছে তাদের ভুল ধরা পড়বে।

কিন্তু, একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে পাহাড়ের অন্ধকার পরিবেশটি আলোতে ঝলমল করে উঠল!

শত্রুরা রশ্মি-গোলা ফায়ার করছে।

মনে হচ্ছে, তারা কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। রশ্মি-গোলা তাদের সামনে এসেই ফাটল। দুজনই এই তিক্ত বাস্তবতা

বুঝতে পারলেন যে, এখন ফিরে যাওয়াটা শুধু মুশকিলই নয়; বরং অসম্ভব।

এখানে কিছু সময় লুকিয়ে থাকবেন এ পজিশনেও তারা নেই। রশ্মিগোলার ফলে সবকিছুই দিনের আলোর মত দেখা যাচ্ছে। তবে ফয়জানের মাত্র একটিই কামনা, তার মৃত্যুপথযাত্রী মুরুব্বীর আশা যে কোন উপায়ে তাকে পূরণ করতে হবে। যদি সে তার মুরুব্বীর আশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই অনুশোচনায় তার বাকী জীবন কাটানো দুর্বিসহ হয়ে পড়বে।

এ ভাবনা তাকে ভীষন অস্থির করে ফেলল।

"চাচা", হঠাৎ করে সে কাসেম ঈশানজাদাকে ডাকল।

"কি ব্যাপার?"

"আপনি এখখুনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন।"

"কি!" বৃদ্ধ কাসেম হতভম্ব হয়ে পড়লেন। "ফয়জান তোমার হুঁশ আছে তো!' তিনি বড়ই স্নেহ ভরে ফয়জানকে তিরস্কার করলেন।

"হ্যাঁ চাচা! আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ ঠিক রয়েছে। অচিরেই এই রশ্মি-গোলার তুফান আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। আর এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আমরা কোন গুলী চালানো ছাড়াই এখান থেকে বের হতে পারব। আমি চাই না, কিয়ামতের দিন আমার মহান পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহকারীর সম্মুখে আমি লজ্জিত হই।" তার কণ্ঠ প্রচন্ড আবেগের তাড়নায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল!

"চাচা! তিনি হচ্ছেন আমার রাহ্‌বর, যিনি আমাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। আমার জীবনে নতুন রং লাগিয়েছেন। আজ কুদরত যখন তার সঙ্গে পুণর্মিলন ঘটাল, কি অবস্থাতেই না ঘটাল!"

"বেটা ফয়জান! এত আবেগময় হয়ো না। আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, তুমি এখনো বালক। এখনো তোমার বাহুতে রয়েছে প্রচুর শক্তি। তোমাকে সামনে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। দীর্ঘ, লম্বা যুদ্ধ।

আমার প্রাণহানি ঘটলে আমাদের মিশনের এতটুকু ক্ষতি হবে না, যতটুকু তোমার কিছু ঘটলে হবে।”

“চাচা, আমি আজ পর্যন্ত আপনার কোন কথা ফেলে দেইনি। কিন্তু আজ আপনি আমাকে কিছু বলবেন না।” ফয়জানের কণ্ঠে দৃঢ়তা দেখে বৃদ্ধ কাসেম কিছুই বলতে পারলেন না। “ফী আমানিল্লাহ, আমার বেটা! আমি যথাসাধ্য তোমার আশা পূরণ করার চেষ্টা করব।” কাসেম এ বলে তার পিঠে স্নেহের চাপড় মারলেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। বৃদ্ধ কাসেমের ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল। এরপর তার দৃষ্টি থেকে তিনি মিলিয়ে গেলেন। ফয়জান মাত্র সেদিক থেকে ঘাড় ফিরিয়েছে অমনি মাত্র কয়েকগজ দূরে একটি রশ্মি-গোলা ফাটল! আলোর ঝল্‌কানিতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল!

দৃষ্টি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে তার প্রথম নজর পড়ল তিন জন রাশান সৈনিকের উপর, যারা মাত্র পনের-বিশগজ দূরে খুবই সতর্কতার সাথে তারই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফয়জানের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ার আগেই তাদের লক্ষ্য করে সে ক্লাশিনকোভ দিয়ে পর পর আট-দশটি ফায়ার করল। অগ্রসরমান সৈনিকরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই জাহান্নামে পৌঁছে গেল।

।। ১০ ।।

মৃত্যুপথগামী সৈনিকদের একজনের মুখে বাঁশি লাগানো। প্রাণ বের হওয়ার পূর্বে সে কোন রকমে বাঁশি বাজিয়ে দেয়।

সেই আওয়াজ শুনে পিছনের সৈন্যগুলো সতর্ক হয়ে যায়। এধরনের বাঁশি রাতে টহলরত সৈন্যরা নিজেদের কাছে রাখে। মরার মুহূর্তেও সেই সৈনিকটি ফয়জানের জন্য মৃত্যুর উপকরণ প্রস্তুত করে রেখে গেল। বাঁশিতে শব্দ হওয়ার সাথে সাথে আকস্মিকভাবে ফয়জানের আশে-পাশের পাহাড়গুলো যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে বদলে গেল!

মনে হল এ এলাকায় শত্রুরা যত ধরনের অস্ত্র ফিট করে রেখেছে সবগুলো দিয়েই তার দিকে তাক করে ফায়ার করছে। যে সৈন্যটি মৃত্যুর মুহূর্তে বাঁশি বাজিয়েছে, সেই আওয়াজের দিকে লক্ষ্য করেই তারা ফায়ার শুরু করে দিয়েছে। ফয়জানের মনে হল, জমিনের এক একটি ইঞ্চি আগ্নেয়গীরিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বৃষ্টির মত গুলী ও গোলা বর্ষিত হচ্ছে।

ফয়জানের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, সে একটা পেয়ালা সদৃশ গভীর ঝুপের স্থানে চুপটি মেরে বসে আছে। তার মাথার উপর দিয়ে গুলী এবং গোলা নানা রকম শব্দ সৃষ্টি করে আগে-পিছনে পড়ছিল। প্রচণ্ডভাবে ফায়ারিং হচ্ছে। অবশেষে রশ্মি-গোলা আসা বন্ধ হয়ে গেল। ফয়জান মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবল। তারপর পথ কি নিরাপদ, না বিপজ্জনক একথা চিন্তা না করে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে মাতালের মত ছুটতে লাগল। তার ধারে কাছে গুলীর আগুন ও লোহার নৃত্য চলছে। কিন্তু তবুও সে তার দৌড় থামাল না।

পনেঁর বিশ মিনিট সে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকল। দৌড়াতে দৌড়াতে পর্বত শ্রেণী যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে এসে সে থেমে গেল।

এখন তাকে কিছুটা সমতলভূমি অতিক্রম করতে হবে। আনুমানিক দেড়শ গজের সামনের সফরটি তার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ের।

দ্রুতগতিতে দৌড়ের কারণে তার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রচন্ডভাবে ওঠানামা করছে।

সে এখানে কয়েক মিনিট থেমে কিছুটা জিরিয়ে নিল ও নিজের ইন্দ্রীয় শক্তিকে সজাগ করে নিল। তার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে, কাসেম ঈশান জাদা অবশ্যই এই এলাকা পার হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছেন। তিনি যদি এখনো এখানে থাকতেন, তাহলে তার উপস্থিতির বিষয়টি সে অবশ্যই অনুভব করতে পারত।

ফয়জান ধীরস্থিরভাবে ক্লাশিনকোভের ম্যাগাজিনটি খুলে চেক

করলো তাতে নতুন ম্যাগাজিন লুড করল এবং মনে মনে আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করতে করতে সেই সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মাত্র কয়েক গজ সে অগ্রসর হতে পেরেছে, হঠাৎ একটা তীব্র আলো তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিল।

।। ১১ ।।

এবার ফয়জানের পালা পড়ল রাশিয়ার বিশেষ টেনিংপ্রাপ্ত স্পাটনাজ"দের সঙ্গে যারা তাকে ঘেরাও করে জীবন্ত ধরার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। তারা এই সমতলভূমিতেই তাদের জাল পেতে রেখেছে। মনে হয় তারা ইতিপূর্বে এখানে শুধু রিহার্সেল দেয়ার জন্য এসেছিল।

রশ্মি-গুলী এত আকস্মিক ও ব্যাপকতার সাথে ফায়ার হচ্ছে যে, সে হতচকিত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ল। এই পেরেশানী অবস্থায় আপ্‌সে তার শাহাদাত আঙ্গুলের চাপ ট্রিগারের উপর পড়ল এবং সেই চাপ ক্রমে বেড়েই চলল। সে বুঝতেই পারেনি যে, কোন ফাঁকে তার ক্লাশিসকোভের সমস্ত ম্যাগাজিনটি খালি হয়ে গেছে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে, তার ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে নতুন ম্যাগাজিন বের করে ক্লাশিনকোভে লাগাতে গেল, কিন্তু সে সময় সে পেল না। এতই আকস্মিকভাবে ছয়জন রাশান স্পাটনাজ কমান্ডো কোন দিক থেকে এসে তাকে জাপটে ধরল, মনে হল যেন মাটি ফুটে তারা বেরিয়ে এসেছে! ফয়জান তাদের বাহু-বন্ধন থেকে উদ্ধারের জন্য অনেক হাত পা ছুড়ল। কিন্তু হঠাৎ মাথার কাছে একটি শক্তিশালী ঘুষির আঘাতে তার সামনে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে এলো। সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

।। ১২ ।।

স্পাটনাজ (Spurt naz) হচ্ছে রাশিয়ার বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেই বিশেষ কমান্ডো বাহিনী, যারা শক্তি, চতুরতা, দৈহিক ট্রেনিং, মার্শাল আর্ট ও অস্ত্র প্রশিক্ষণে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা ফৌজ। তাদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছিল একমাত্র ন্যাটো জোটভুক্ত সৈন্যেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এসব সেনাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস-যজ্ঞ চালানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। মানবতা ও দয়া বলতে কোন শব্দ তাদের অভিধানে ছিল না। তাদেরকে এত মারাত্মক ট্রেনিং দেওয়া হত যে, যদি কখনো মার্কিন সমর্থিত ন্যাটো বাহিনী রুশ সমর্থিত পূর্ব ইউরোপের উপর হামলা করে বসে, তাহলে রাশান স্পাটনাজ বাহিনী এমন ধ্বংস-তান্ডব চালাবে যে, ন্যাটো বাহিনীর হামলা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। রাশিয়া এ ধরনের সৈন্য পূর্ব জার্মানী এবং আফগানিস্তানের কিছু কিছু অংশে মোতায়েন করেছে।

স্পাটনাজ কমান্ডো বাহিনী

ফয়জানের যখন জ্ঞান ফিরে এলো, সে নিজেকে একটি তাঁবুতে দেখতে পেল।

মনে হয় রাত একপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁবুর ভিতর আলো বলতে কোন কিছু নেই। তার হাত দুখানা খুব শক্ত করে একটা বিশেষ ধরনের রশি দিয়ে পিছ মোড়া করে বাঁধা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও।

জ্ঞান ফিরে আসার পর যে শব্দটি সবার আগে সে শুনতে পেল, সেটা হচ্ছে আকাশে বিদ্যুতের প্রচণ্ড গুরু গম্ভীর আওয়াজ। মৌসুমটিই হল এমন। যে কোন মুহূর্তে আকাশ ছেয়ে যায় মেঘমালা দিয়ে এবং তারপরই শুরু হয়ে যায় মুষলধারে বৃষ্টি এবং সেই বর্ষণ চলতে থাকে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত।

ফয়জানের মনে প্রথম যে ধারণাটা হল, সেটা হচ্ছে, কুদরত হয়ত তাকে দিয়ে আরো অনেক কাজ আদায় করে নেবে। এজন্যই সে এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তার পক্ষে অদৃশ্য সাহায্য কাজ করছে।

তাঁবুর ভিতর সে ছাড়া আর কেউ নেই। তবে তাঁবুর বাইরে অবশ্যই সশস্ত্র পাহারা রয়েছে। বাইরে সৈনিকদের পরস্পরের কথাবার্তাগুলো স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। ফয়জান সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করতে পারল, সে রাশান স্পাটনাজ এর হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে।

রাশিয়ার এই বিশেষ বাহিনী আসার খবর মুজাহিদরা জানেন। বরং ইতোমধ্যে তারা হেরাত ও কান্দাহার রণাঙ্গনে স্পাটনাজ বাহিনীর দুই কোম্পানীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্তও করে দিয়েছেন।

রুশ কর্মকর্তারা এ এলাকায় অতিসম্প্রতি এই বিশেষ বাহিনীর কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফয়জান সোজা হতে চাইল। কিন্তু আকস্মিক তার মাথার পেছনের অংশ থেকে ব্যথার একটা তরঙ্গমালা তার পুরো অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলল।

সে প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করতে লাগল। এরই মধ্যে তাঁবুতে কারোর ঢুকার পদধ্বনি শুনা গেল।

ফয়জান কৃত্রিম উপায়ে বেঁহুশ হওয়াটা নিজের পক্ষে নিরাপদ মনে করল এবং সে অজ্ঞানের মত পড়ে রইল।

ভিতরে প্রবেশকারী হল দুজন।

দুজনকেই মাতাল মনে হচ্ছে।

তাদের একজন নিজের পা দিয়ে ফয়জানের এক পাশে প্রচন্ডভাবে আঘাত করল।

আঘাতটা মারাত্মক। কিন্তু ফয়জান নিজের জিহ্বাটা দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে ধরল এবং শরীরে কোন ধরনের নাড়াচাড়া হতে দিল না। মনে হয়, শত্রুরা দেখতে চাচ্ছে যে, সে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে কিনা।

কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে হায়েনাটা জোরে অট্টহাসি হাসল। সে ফয়জানের উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালি ছুড়ে দিয়ে নিজের সঙ্গীকে বলল, "মনে হচ্ছে, আঘাত খুবই জোরে লেগেছে।"

"মরে যায়নি তো আবার?" দ্বিতীয় সৈনিকটি, নেশার ঘোরে জিজ্ঞেস করল। তার শব্দগুলো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।

"আরে, এরা হচ্ছে পাহাড়ের মত শক্ত প্রাণ। এই কমবখ্‌ত এত তাড়াতাড়ি মরবে না।"

"ছাড়ো এই নরাধম মোল্লাকে, মরতে দাও ওকে।"

"বাইরে আবহাওয়া অনেক শানদার হচ্ছে। এস এক দু' ঢোক আরো খেয়ে নিই। খানিক পর সেই হারামী মেজর এসে যাবে।" আরেকজন তার বাহু ধরে বলল।

মনে হচ্ছে, তারা তাদের অফিসার আসার আগেই কোন মদের বোতল শেষ করতে চাচ্ছে।

অন্যজনও মেজরকে খুব তুচ্ছ ভাষায় গালি দিতে লাগল। দুজনই রুশ ভাষার একটা অশ্লীল গান বিশ্রী কণ্ঠে গাইতে গাইতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

।। ২ ।।

"স্পাটনাজ" -এর কথা মনে হতেই ফয়জান দুটি সম্ভাব্য পন্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। হয় সে পালিয়ে যাবে। অথবা পালানোর চেষ্টায় মারা যাবে। এ দুটি পথ ছাড়া তার সামনে ভাল আর কোন পথ নেই। একবার যদি সে জীবিত স্পাটনাজদের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে তারা তার শরীরের প্রতিটি জোড়া জোড়াকে শরীর থেকে কেটে আলগা করে ফেলবে। এরা বর্বরতার জন্য সমস্ত বিশ্বে কুখ্যাত। ফয়জান জানে, যে আফগান অঞ্চলে স্পাটনাজদের কনভয় গেছে, সেখানে মানুষ, জীবজন্তু কিছুই প্রাণে বাঁচেনি। তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে। এরা শুধু নিজেদের পাষান মনকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য বসতির পর বসতি, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কান্দাহার, হেরাত ও গজনীর কত গ্রাম ও জনবসতী তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার সীমা নেই! আজও এসব জনপদ তাদের নির্মম নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আছে। সেই দুজন "স্পাটনাজ" বের হতেই ফয়জান নিজের শরীরকে টেনে সোজা করল। তারপর কোন মতে উঠে বসল। হাত দুটো পিঠের নিচ দিয়ে সামনে নিয়ে এল। এখন সে অনেকটা সহজ পজিশনে আছে বলে মনে হচ্ছে।

পালানোর চিন্তা মাথায় আসতেই তার পুরো শরীরে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

যদি সে এখান থেকে দু মাইল দূর পর্যন্তও পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে নিরাপদে নিজের সঙ্গীদের কাছে পৌঁছতে পারবে। গাঢ় অন্ধকারে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সে অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে পরিস্থিতিটা যাচাই করে নিল।

এক কোনে লোহার একটি খাটে দু'টি ক্লাশিনকোভ রাখা আছে। মনে হয়, যে গাধা দুটো শরার পান করার জন্য বাইরে গেছে, তাদেরই হবে। শত্রুরা তাকে যে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সেটা কেটে ফেলার কোন পন্থা ফয়জান খুঁজে পেল না।

এখন এখানে আরো সময় নষ্ট করলে, তার আরো নতুন কোন বিপদ আসতে পারে। সে তার হাত দিয়ে একটি ক্লাশিনকোভ গলায় ঝুলিয়ে নিল এবং অপরটি বাঁধা হাত দিয়ে ধরে রাখল।

সে তার একটা বন্দুক শত্রুদের কব্জায় দিয়ে তাদের দু'টি রাইফেল সে নিয়ে যাচ্ছে। তার পাঠানী মন-মানসিকতা তাকে সায় দিচ্ছে না, তার অস্ত্র শত্রুদেরকে সমর্পণ করে সে জীবন্ত চলে যাবে। সে কনুইয়ের উপর ভর করে বাঁধা হাত দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহারাদারদের বিপরীত দিক থেকে তাঁবুর পর্দাটাকে সামান্য উঠিয়ে বাইরে অন্ধকারে উঁকি মারল। চোখের উপর সে অনেক জোর খাটাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দূর পর্যন্ত কেউ আছে বলে মনে হল না। মনে মনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি "ওয়া-জাআ'লনা মিম বায়নি আইদীহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া-মিন খাল্‌ফিহিম ছাদ্দান ফাআগ্‌শাইনা হুম ফাহুম লা ইউব্‌ছিরূন।" (আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।) পড়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়াল।

তার হাত দুখানা যদিও বাঁধা, কিন্তু সে এই সমস্যাটাকে মোটেও পরোয়া করল না। এটা হল তার জীবন মরণের প্রশ্ন। তাই সে সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করল। বিশ গজ দূর পর্যন্ত সে দক্ষ সৈনিকের মত পাথুরে জমিনের উপর দিয়ে কনুইয়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি

দিয়ে সামনে এগোলো। কিছু দূর এগিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো এবং মাথা নুইয়ে চলতে লাগল। দেড়শ গজ দূরত্ব সে এভাবে পার হল। দ্রুত তার আন্দাজ হয়ে গেল, সমতলভূমি থেকে তাকে তেমন দূরে নেয়া হয়নি। শত্রুরা মনে হয় এ এলাকার সব স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এমনিতেই তারা রাতের অন্ধকারে কোন আফগান বন্দীকে নিজেদের পিছনের বাংকারে নিয়ে যাওয়ার মত ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। তারা দিনের আলোয় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বন্দীদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

।। ৩ ।।

চিতা বাঘের মত নিঃশব্দে সে বাঁধা হাত নিয়ে সমতলভূমির কাছে চলে এলো। বাঁধা হাত ও স্পন্দিত মন নিয়ে সে অবশেষে জমিনের এই অংশও পার হল। সে খুব কষ্টে সবে মাত্র মুজাহিদদের মারকাজগামী সড়কটিতে এসে ওঠেছে অমনি তার পিছন দিকে কেয়ামত শুরু হয়ে গেল! মনে হয়, তার পালোনোর ব্যাপারটা শত্রুরা জেনে ফেলেছে। রাশান "স্পাটনাজ"রা মাতালের মত গুলী চালাচ্ছে। রশ্মি-গুলী ছুড়ে তারা রাতকে দিনের আলোর মত করে ফেলছে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ফয়জান তাদের আওতা থেকে বাইরে চলে গিয়েছে। তার এতটুকু সুযোগেরই প্রয়োজন ছিল।

সে জানে বৃদ্ধ কাসেম ঈশানজাদা যদি গন্তব্য স্থলে পৌঁছে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তিনি মুজাহিদদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং নিজেদের একজন সঙ্গীকে শত্রুদের বেষ্টনীর মধ্যে রেখে দিয়ে তারা কোন ক্রমেই নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন না।

বাঁধা হাত খোলার এখনো কোন পন্থা সে খুঁজে পাচ্ছে না। স্পাটনাজরা নাইলনের মজবুত অথচ চিকন রশি দিয়ে তার হাত দুখানা বড় শক্তভাবে বেঁধে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, এগুলো কমান্ডোদের বিশেষ রশি। কমান্ডোরা এ সব রশি নিজেদের সঙ্গে রাখে। কয়েক জায়গায় সে চুখা পাথর দিয়ে রশি কাটার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না।

বিরামহীন দৌড়ানোর কারণে এখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে যাচ্ছে। হাত যদি খোলা থাকত তাহলে ব্যাপার ছিল ভিন্ন। বাঁধা হাতে দুটি রাইফেল নিয়ে তাকে এখনো আরো অন্ততপক্ষে সাত-আট মাইল পাহাড়ের দূর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে।

সে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে যত বেশী সম্ভব দূরে সরে যেতে চাচ্ছে। দিনের আলোর মধ্যে তার মুক্তি মানে হল সে কতটুকু তাদের মারকাজের নিকটবর্তী হতে পেরেছে! ফয়জান জানে, "স্পাটনাজ-এর সদস্যরা শিকারী কুকুরের মত তার পিছে ধেয়ে আসছে এবং ভোরে হেলিকপ্টারগুলোও তার অনুসন্ধান অভিযানে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু কেন জানি, একটা অদৃশ্য শক্তি তার মনকে একটা কথা বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে একবার হলেও অবশ্যই তার পথপ্রদর্শক মানুষটির সঙ্গে তার জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ করতে পারবে।

গুলী-গোলা এবার আবারো তার কাছে ও দূরে ফাটছে। ফয়জান এবার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ রাস্তা অবলম্বন করলো।

।। ৪ ।।

মোল্লা মীর দাদখান সামনের কোন বাংকার থেকে ওয়্যারলেসে সংবাদ পেলেন, কাছাকাছি কোথাও প্রচন্ড ফায়ারিং হচ্ছে। কয়েক মিনিট আগে কাসেম ঈশানজাদা এখানে পৌঁছে ফয়জানের ব্যাপারে তাকে সবকিছু বলে দিয়েছিলেন। মীরদাদখান এই ফায়ারিং থেকে অনুমান করতে পারলেন, অন্ততপক্ষে ফয়জান শত্রুদের হাতে ধরা পড়েনি। নয়তো রাতের অন্ধকারে শত্রুরা এমনভাবে লক্ষ্যহীন অস্ত্র চালাত না।

কিন্তু। এ কথাটা তার ভালভাবে বুঝে আসল যে, শত্রুরা ফয়জানের পশ্চাদ্ধাবন করছে। যদি খোদা না-খাস্তা ফয়জান জীবিত অবস্থায় তাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তারা তাকে চিনে ফেলে, তাহলে তারা তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে? এটা ভাবতেই তিনি শিউরে উঠলেন।

তিনি যে বাংকার থেকে খবর পেয়েছিলেন, সেই বাংকারের মুজাহিদদেরকে নির্দেশ দিলেন, "তোমরাও পাল্টা ফায়ার করে শত্রুদেরকে নিজেদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখ। আমি দ্রুত তোমাদের কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে সাহায্য পাঠাচ্ছি। মনে হচ্ছে, ফয়জান শত্রুদের ঘেরাও-এর মধ্যে পড়েছে। তাকে যে কোন অবস্থায় হোক বাঁচাতে হবে। তার জন্য যে কোন চড়ামূল্য আমাদেরকে দিতে হোক না কেন!"

তিনি শত্রুদের নিকটবর্তী মুজাহিদদের আরেকটি কেন্দ্রে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অতিসত্বর তিনি লাইন পেয়ে গেলেন। তাদেরকে ফয়জানের বিপদের কথা জানিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

ফয়জানের নামটি কোন মুজাহিদের কাছে অপরিচিত ছিল না। সেই মারকাজে বিদ্যমান মুজাহিদরা যখন জানতে পেল যে, ফয়জান কুখ্যাত স্পাটনাজ-এর ঘেরাও এর কবলে পড়েছে তখনি তারা সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

।। ৫ ।।

উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান ফয়জান হঠাৎ অন্য দিক থেকে ফায়ারিং এর শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। সে ফায়ারিং-এর শব্দের প্রতি কান লাগাল। মনে হল আচানক তার ধমনীতে রক্তের গতি বেড়ে গেছে। সে পরিষ্কারভাবেই বুঝে ফেলল যে, সে এখন আর একা নয়। পতনোন্মুখ অন্ধকারের মাঝে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন তার মুজাহিদ ভাইয়েরা। তারাই রাশান স্পাটনাজদেরকে নিজেদের দিকে ব্যস্ত রাখার জন্য প্রচন্ডভাবে ফায়ার করছেন। এরফলে বাস্তবেই শত্রুদের দৃষ্টি বিভক্ত হয়ে পড়ল। ওরা মুজাহিদদের ফায়ারিং শুনে হতচকিত হয়ে পড়ে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে তারা বেপরোয়া ফায়ার শুরু করে দিল।

এই ফাঁকে ফয়জান খানিক দম নেওয়ার অবকাশ পেয়ে গেল।

একটা ক্লাশিনকোভ এখনো পর্যন্ত ফায়ারিং পজিশনে বাঁধা হাতটা ধরে রেখেছে। পনের বিশ মিনিট পর্যন্ত সে এখানেই নিশ্চুপ বসে বিশ্রাম নিল। এখন সে হাতটা মুক্ত করার চেষ্টা বাদ দিয়েছে।

হাত এমন মারাত্মকভাবে বাঁধা যে, মারকাজে পৌঁছেই এ জঞ্জাল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর নিজেকে উদ্যমী ও সতেজ মনে হল। শত্রুরা তাকে বেঁহুশ অবস্থায় নির্দয়ভাবে মেরেছিল। এ কারণেই শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় সে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে ব্যথার যে ঢেউ উঠছে তা মাথার পিছনের অংশের দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু তার দৃঢ়তা ও মনের জোরের কারণেই সে এখনো পর্যন্ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে।

।। ৬ ।।

দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে প্রভাতের আলো। ঘন কুয়াশাকে বিদীর্ণ করে সূর্য উঁকি মারতে শুরু করেছে। হঠাৎ বেশ কিছু দূরে পর্বতমালার মাঝে ফয়জান শুনতে পেল নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার-এর গুরুগম্ভীর আওয়াজ। সেই আওয়াজে মনে হল পাহাড় পর্বত প্রকম্পিত হয়ে ওঠছে। ফয়জান একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। তার চোখ দুটো তন্দ্রার কারণে বন্ধ হয়ে আসছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করল ঘুমের ঘোরে তলিয়ে না যেতে; কিন্তু রাত ভর দৌড়াদৌড়ি ও পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহখানা একদিকে ঢলে পড়ল। সে হারিয়ে গেল গভীর ঘুমে। হঠাৎ একদম কাছেই মানুষের পদধ্বনিতে তার চোখ দুটো খুলে গেল। অনিচ্ছাকৃতভাবে তার বাঁধা হাতখানা চলে গেল কোলে রাখা ক্লাশিনকোভের দিকে। জাপটে ধরল ফায়ার করার জন্য। কিন্তু নিজের কর্ণ কুহরে ভেসে আসা একটি শব্দে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল ঃ

"ফয়জান! তার প্রয়োজন নেই। আল্লাহপাক দয়া করেছেন। তুমি নিজেদের লোকদের মধ্যেই রয়েছ।"

ফয়জান চোখ খুলে তাকাল। তখনও তার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। সঙ্গে সঙ্গে 'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' পড়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলো।

জনৈক মুজাহিদ মশ্‌ক খুলে ফয়জানের মুখে ধরলেন। সত্যিই তার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল পানির তৃষ্ণায়। আরেকজন মুজাহিদ নিজের খঞ্জর দিয়ে ফয়জানের হাতের রশিটা কেটে দিলেন। রশি থেকে মুক্ত হয়ে ফয়জান তার হাতদুটো জোরে জোরে ঝট্‌কা দিল, যাতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে।

খানিক পর তারা ফয়জানকে একটি ঘোড়ায় বসিয়ে মারকাজের দিকে নিয়ে গেলেন, যেখানে তার বৃদ্ধ উপকারী মানুষটি আল্লাহ পাকের কাছে জীবনের আরো কয়েকটি মুহূর্ত ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। এখন তার একটাই ইচ্ছা, তার রং ভরা সুন্দর ছবিখানা আরেকবার নিজের চোখ দিয়ে দেখবেন। তার মন বলছে, ফয়জান অবশ্যই ফিরে আসবে। তার পরপারের যাত্রী হৃদয়টি বার বার আফসোস করছে, "হায়, আমি যদি ওকে দিয়ে কাসেম খানকে ডাকতে না পাঠাতাম।"

'আমি বিদায় নিচ্ছি বাবা, জেহাদ কখনো ছেড়ো না'

কাসেম তার কাছে পৌঁছে গিয়েছেন।

দুজন একই গ্রামের।

তারা একই তীরের শিকার।

তাদের দুজনের কাহিনী একই রকমের।

তারা দু'জনই তাদের নিজ-নিজ পরিবারের একমাত্র সদস্য হয়ে বেঁচে আছেন। তাদের গ্রামে রাশানরা যখন বর্বর হামলা চালায়, তখন সেই গ্রামের একটি মনুষ্য প্রাণীও বাঁচেনি। সবাইকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। অলৌকিককভাবে একমাত্র তারা দুজন প্রাণে বেঁচে যান।

বৃদ্ধ মুহাম্মাদ গুল রাত থেকে এ পর্যন্ত কয়েকবার জ্ঞান হারান। মেডিক্যালের ছাত্রটি এবং কাসেমখান তার শিয়রেই বসা ছিলেন। তিনি কাসেম ঈশানজাদার সাথে মন খুলে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন। প্রায় এক বছর পর তারা মিলিত হয়েছেন। মুহাম্মাদ গুলকে খুবই শান্ত ও স্থির দেখাচ্ছে। এখন শুধু একটা বোঝাই তার মনের মধ্যে চেপে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ফয়জান!

সুবহে সাদিকের সময় যখন একজন মুজাহিদের আজানের হৃদয়গ্রাহী সুর কানে ভেসে এলো, মনে হল যেন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের হারানো সমস্ত অনুভূতি ফিরে এসেছে। তিনি ঈশানজাদাকে বললেন

তাকে ভর দিয়ে বসাতে। তিনি চৌকির উপর বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনজনই দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। যখন মুহাম্মাদ গুল দোয়া শেষে আমীন বলে হাত নিচে নামালেন এবং দৃষ্টি উঠিয়ে সামনে দেখলেন, তখন জীবনের এক নতুন স্পন্দন তার চেহারাকে উদ্ভাসিত করে তুলল! ফয়জান তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

।। ২ ।।

"ফয়জান, আমার বেটা!"

তিনি অস্থির চিত্তে নিজের হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিলেন। ফয়জান ব্যাকুল হয়ে সামনে দৌড়ে গেল এবং তার বুকের সাথে মিলে গেল।

"আমার মন বলছিল, তুমি অবশ্যই আসবে। হে আমার রব! তোমার লাখো শুকরিয়া, এখন আমি আর আমার মনে কোন বোঝা চেপে দুনিয়া থেকে যাচ্ছি না।" তিনি মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলেন।

"ফয়জান! তোমার মত আমারও একটা ছেলে ছিল। কাবুল গিয়ে সেও স্বাধীন চিন্তাধারা ও তথাকথিত প্রগতিবাদী হয়ে যায়। যখনই সে কলেজ থেকে ছুটিতে বাড়িতে আসত, আমার কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গুণ সম্পর্কে লেকচার দিত। আমি তাকে দু-একবার বুঝাতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাতই করত না। আমি তাকে একদিন বলেছিলাম, বাবা! তোমাদের যুবকদের মধ্যে এই একটা জিনিসেরই অভাব রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আঘাত না খাও, তোমরা মুরুব্বীদের কথায় কর্ণপাতই কর না। জানি না, তোমরা কেন বেশী বুঝার চেষ্টা কর। অথচ তোমাদের অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা! তোমরা যে চিন্তাধারা গ্রহণ করছো, সেটা ভ্রান্তও তো হতে পারে! তোমাদের মস্তিষ্ককে তোমরা এত অকাট্য কেন ভাব? তোমরা নিজের যুক্তিবলে যে মতবাদ গ্রহণ করছ, তার কুফল একদিন তোমাদের ও তোমাদের পুরো জাতিকে ভোগ করতে হবে। এখনো সময় আছে, তোমরা তোমাদের

পূর্বপুরুষদের আদর্শকেই গ্রহণ কর, যারা বিশ্বে ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যা হোক, আমি যখন দেখলাম, আমার ছেলে আমার কথা মোটেও মানছে না, আমি খামোশ হয়ে গেলাম।"

মুহাম্মাদ গুলের আওয়াজ খুব কষ্টে বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে কথা তাঁর গলায় এসে আটকে গেছে।

"একবার সে ছুটিতে এল। আনন্দে তার চেহারাখানা ঝলমল করছে। সে এসেই আমাকে বলল, "বাবা! আমাদের ভাগ্য খুলে গেছে। রুশ বন্ধুরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এখন আফগানিস্তানের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার চেহারা পাল্টে যাবে।"

"হ্যাঁ, বেটা!" আমি বললাম, "তুমি ঠিকই বলছ। এখন সত্যিই আফগানিস্তানের তকদীর পাল্টে যাবে। জিল্লতী, লাঞ্ছনা, অপমান ও গোলামী এসবই আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এক মহাবিপর্যয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

যে অশুভ সময় না আসার জন্য আফগানিস্তানের প্রতিটি ঈমানদার মানুষ দোয়া করত, সেই দুর্দিন এসেই গেল।

সে দিনও আমার ছেলেটি আমার কথা বিদ্রূপের সাথে উড়িয়ে দিল। কিন্তু তৃতীয় দিন লাগমান প্রদেশ থেকে তার মামা একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন। তিনি বিস্তারিত সবকিছুই বললেন যে, রুশ সেনারা তার পরিবারের সব সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করেছে! গ্রাম কে গ্রাম তাদের নৃশংসতার শিকার হয়েছে! সে কোন মতে জান নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে! এ দুঃসংবাদ শুনে আমার বোকা ছেলে একদম নির্বাক হয়ে গেল। আমার ছেলেটি ছিল খুবই আবেগপ্রবণ। প্রতিটি পাঠানের মতই আবেগপ্রবণ। কিছু না কিছু ঘটিয়ে ফেলার জন্য সব সময় থাকত প্রস্তুত।

সে দিনই রাতের বেলায় হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেল। দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে রুশ সেনারা তাদের বন্ধুত্বের যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের কাছে সেসব লোমহর্ষক সংবাদগুলো রীতিমত আসছিল। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলটি পাকিস্তানী সীমান্তের কাছে

হওয়ার কারণে আমরা তখনো তাদের সে 'বন্ধুত্বের বর্বরতা থেকে নিরাপদ ছিলাম।

তৃতীয় দিন হঠাৎ করে আমার ছেলেটি ফিরে এল। ফয়জান! জান, সে এসে আমাকে কি বলল?"

"কি বলল?" ফয়জানের মুখ থেকে আপসে বেরিয়ে এলো।

"যে ছেলে সব সময় রাশিয়ানদের গুণ-গান গাইত, যে ছেলে রুশ সেনার আগমনকে আগানিস্তানের জন্য সৌভাগ্যের বস্তু মনে করত। যখন তিনদিন পর্যন্ত সে দূর ও কাছাকাছি অঞ্চলে গিয়ে সরেজমিনে রুশ কমরেডদের বর্বরতা নিজের চোখে দেখল, তখন তার দুনিয়াই পাল্টে গেল। সে এসে বলল, "বাবা! আমাদেরকে আজই এ এলাকা ছাড়তে হবে। লক্ষ লক্ষ আফগান তৌহিদী জনতা নিজেদের জান ও মান-সম্মান রক্ষার খাতিরে প্রতিবেশী মুসলিম দেশে আশ্রয় নিচ্ছে। আব্বা! আপনি পূর্বে যা বলতেন তা-ই ছিল খাঁটি-সত্য। আমি যৌবনের আবেগে বুঝে উঠতে পারিনি। সত্য আমার কাছে পর্দাআবৃত ছিল। এখন আমার বোধোদয় হয়েছে।" এ বলে সে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথা চুম্বন করে, শরীরে হাত বুলিয়ে সাহস যোগালাম এবং ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'বাবা! তুমি হচ্ছ আফগান। তোমাকে কাঁদলে চলবে না। নিজের ফরজ ও দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আজ থেকে তোমাকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও সৈনিক হতে হবে।'

নিজের রাইফেলটি ওর হাতে সঁপে দিয়ে ওকে বললাম, 'আমার কলিজার টুকরো ছেলে! এই রাইফেল থেকে বের হওয়া গুলী ইংরেজ আধিপত্যবাদীদেরকে আমাদের এ পবিত্র ভূমিতে পা জমানোর সুযোগ দেয়নি। আমার হাত এখন বৃদ্ধ হতে চলেছে। মনে হয় এত দ্রুত ট্রিগারে চাপ দিতে পারব না, যত তাড়াতাড়ি তোমরা জোয়ানরা পারবে। আজ থেকে এ আমানতটি তোমার কাছে সোপর্দ করছি।"

আমরা দ্বিতীয় দিন এক মোহাজির কাফেলার সঙ্গে এখান থেকে বের হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

সেটা ছিল আমার জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের দিন। ঐ দিন আমার ছেলেটির হারানো ঈমানী চেতনা ফিরে এসেছিল। কিন্তু...!!"

এ বলে মুহাম্মাদ গুল কাঁদতে লাগলেন। তার বুড়ো চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর সাদা দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। তরুণ পুত্রের কথা মনে পড়ায় তার মনটা খুব ব্যথিত হয়ে পড়ল।

"এই আনন্দ ছিল সাময়িক।" তিনি একটা দীর্ঘ শীতল শ্বাস ছেড়ে বললেন।

"যখন আমরা সকাল বেলায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ একটা রুশ হেলিকপ্টার গানশীপ সেখানে এসে হাজির হল। হেলিকপ্টার থেকে রুশ সেনারা কোন ওয়ার্নিং ছাড়াই নিরীহ, নিরস্ত্র লোকদের উপর বেপরোয়াভাবে আগুন বর্ষন করতে লাগল। আমার ছেলেটি আমার বারণ সত্ত্বেও রাইফেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। মনে হল ও কাছের কোন পাহাড়ে বসে নীচ দিয়ে উড়ন্ত হেলিকপ্টারটিকে থ্রি-নট থ্রির মত মামুলী রাইফেল দিয়ে ভূপাতিত করবে। ছেলেটি মাত্র কয়েক গজ দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। হেলিকপ্টারটি ওকে দেখে ফেলে। হেলিকপ্টারের মেশিনগান থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলো জ্বলন্ত অঙ্গার এসে ওকে ঝাঁঝড়া করে ফেলল! আমি দৌড়ে ওর কাছে পৌঁছলাম। আমার বেটা, আমার কলিজার টুকরো শহীদ হয়ে গিয়েছিল! আমার পিছনে আরেকটি হেলিকপ্টার এসে আমার বাড়িটার উপর রকেট নিক্ষেপ করল, ফলে আমার স্ত্রী সহ আরো অনেক মহিলা যারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল সবাই শাহাদত বরণ করে।"

বৃদ্ধ মুহাম্মাদ গুলকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

।। ৩ ।।

"বেটা ফয়জান! এরপর আমি যেভাবে হিজরত করেছি, সেটাও এক ভিন্ন কাহিনী!

আমার ছেলেটা যখন অবুঝ ও ঈমান থেকে দূরে ছিল, তখন পরচম পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। ওর এই পরিচয়টি আমার কাজে এলো। আমি মাওলানা ইউনুস খালিস সাহেবের নির্দেশে, যিনি আমাদের আমীর ছিলেন, কাবুল চলে এলাম। এখানে এসে কমিউনিস্ট প্রশাসনকে আমার ছেলের প্রাক্তন পরিচয়ের বরাত দিয়ে আমি সরকারী একটা চাকুরী জুটিয়ে নিতে সফল হলাম।

কিছু লেখাপড়া জানতাম। তাই কোন না কোনভাবে "খাদ" - এর হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হলাম।

তোমাদের মত অনেক যুবক, যারা এই তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবের আসল রূপ জেনে এই মতবাদকে ধিক্কার জানাচ্ছিল এবং এই চিন্তাধারাকে লাথি মেরে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, বেদ্বীন, মুরতাদ ও নাস্তিক প্রশাসন সে সব যুবককে ধোলাই করার জন্য "খাদ" এর কসাই খানায় পাঠিয়ে দিত। আমি এধরনের যুবকদের পিছনে মেহনত করতাম। তাদেরকে নিজেরই অসম্পূর্ণ ছবি ভেবে তাদের মধ্যে রঙের ছাপ লাগাতাম। তাদেরকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য উজ্জীবিত করে তুলতাম। এবং সময়মত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদেরকে নাস্তিক ও মুরতাদ শত্রুদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি দিতাম।।"

হঠাৎ মুহাম্মদ গুল প্রচন্ডভাবে কাঁশতে লাগলেন। তিনি পেটের উপর হাত রেখে মুষড়ে পড়লেন।

তার অবস্থা দেখে ফয়জান ঘাবড়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাকতে বাইরে এলো।

"কি ব্যাপার? কি হয়েছে?" সামনেই কাসেম ঈশানজাদা এক হাতে কাহ্‌ওয়ার কেতলী ও অন্য হাতে পেয়ালা ধরে সেদিকেই আসছিল।

"চাচা! তার অবস্থা আবার শোচনীয় হয়ে গেছে।

"আপনি ভিতরে যান। আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

।। ৪ ।।

ডাক্তারকে নিয়ে ফয়জান যখন সেখানে পৌঁছল, তখন কাসেম ঈশানজাদা তার বাল্যকালের বন্ধু মুহাম্মদ গুলের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন।

তাদেরকে ভিতরে আসতে দেখে মুহাম্মদ গুল চোখ মেললেন।

ফয়জানের দিকে এক নজর তাকিয়ে তাকে কাছে আসার জন্য ইশারা করলেন।

"বেটা ফয়জান! আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহপাক মনে হয় আমাকে শেষবারের মত তোমাদের সঙ্গে দেখা করাতে চেয়েছিলেন। আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে তার আদালতের দিকে যাচ্ছি!"

"ছেলে আমার! নিজের কর্তব্য কখনো ভুলবে না! আমি বিদায় নিচ্ছি বেটা, জেহাদ কখনো ছেড়ো না। বিদায়! আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও সহায় হোন!!" তিনি চোখ মুদলেন।

ডাক্তার অসহায় ভাবে তার শিরার উপর হাত রাখলেন।

কিন্তু তার কাছে এমন কোন ওষুধ ছিল না, যেগুলো এধরনের রুগীদের জীবন সামান্য মুহুর্তের জন্যও বাঁচাতে পারে!

ফয়জান খাটের সাথে ঘেঁষে বসে পড়ল। তার কানে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে মুহাম্মদ গুলের কুরআনী আয়াত তিলায়াতের বিড়বিড় শব্দ ভেসে এলো। এক সময় বিড়বিড় শব্দও ধীরে ধীরে থেমে আসতে লাগল।

কাসেম ঈশানজাদা তার শিয়রে বসে সূরায়ে ইয়াসীন তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন।

যখন শেষ আয়াতটি পড়ে তাঁর বন্ধুর নাড়িতে হাত রাখলেন; সেখানে নেই মোটেও জীবনের আর কোন স্পন্দন। চিরদিনের জন্য তিনি নীরব হয়ে গেলেন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন"—কাসেমের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

ফয়জান এবং ডাক্তারও এ আয়াতটি উচ্চারণ করলেন।

"আল্লাহর শপথ! তুমি কৃতকার্য হয়েই তার দরবারে যাচ্ছ।"

কাসেম ঈশানজাদা কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন। ফয়জান উগলু অনেক চেষ্টা করল কান্না থামানোর; কিন্তু ধৈর্যের সমস্ত বন্ধন টুটে গেল। কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে আসল। সে তার কাঁধের চাদরটা দিয়ে মুহাম্মদ গুলকে ঢেকে দিল। এরপর তার শিয়রের কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল। সে দোয়া করল, হে মাবূদ! আমার এই রাহ্‌বারকে তুমি শান্তির উদ্যানে স্থান দান কর। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর চেষ্টা ও জিহাদকে তুমি কবুল কর। আমীন।

শেষ পরিণতি

ইয়াসমীন হঠাৎ অস্থির হয়ে হুড়মুড় করে ওঠে বসল। তার চোখে এখনো ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। সে তার রুমে দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে পারল। কারণ কে যেন তার পায়ের আঙ্গুল ধরে টান মেরেছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় টেবিল ল্যাম্প-এর বাল্বটি জ্বালাল। বাস্তবেই কেউ একজন আছে। লোকটি মুখোশ পরা। তবে চিনতে আর বাকী রইল না মানুষটা কে—সে হচ্ছে তার প্রিয় মুজাহিদ স্বামী ফয়জান উগ্‌লু। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রথমে সালাম করল। তারপর জিজ্ঞেস করল ঃ

"আপনি কখন এলেন?" এখন আর ফয়জানের মুখে মুখোশ নেই। সে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলেছে।

"এখনি এলাম। আল্লাহ মঙ্গল করুন, এ এলাকায় সেনাবাহিনীর বেশী আনাগুনা কেন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝে আসছে না। আচ্ছা, চাচাজান কোথায়? তিনি কি এসে গেছেন?" সে এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেলল।

"আজকাল রাতের বেলায় আব্বাজান ঘরে খুব কমই আসেন। আজও মনে হয় আসেননি।" ইয়াসমীন বলল।

ফয়জান কাবুল এলেই ইয়াসমীনের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যায়। যদি কখনো দশ-পনের দিন পর্যন্ত আসার সুযোগ না হয়, তাহলে কোন উপায়ে খবর পাঠিয়ে নিজের হাল-অবস্থা তাদেরকে জানিয়ে দেয়।

সে মুজাহিদ নেতা মোল্লা মীরদাদখানের সঙ্গে মেজর উরখানের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মেজর উরখান এখন মুজাহিদদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তিনি সে সমস্ত স্থানে হাত দিতে পারেন, যেখানে আহমাদ তুরসুনের পৌঁছা অসম্ভব ব্যাপার।

মেজর উরখানের মুজাহিদ গ্রুপে শামিল হওয়াটাকে মুজাহিদরা আল্লাহর গায়বী মদদ মনে করেন। "খাদ"-এর হেড কোয়ার্টারে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযানের যে সব গোপন পরিকল্পনা করা হয়, সে সম্পর্কে মুজাহিদরা তারই মাধ্যমে পূর্বেই খবর পেয়ে যান। উরখানের সাহায্যে মুজাহিদরা কয়েকটি অপারেশন চালিয়েছেন এবং সেই অভিযানগুলো পরিপূর্ণ সফলও হয়েছে।

"খাদ"-এর অপারেশনাল চীফ কর্ণেল শোলোখোভ কিংকর্তব্যবিমুঢ় ছিল। তার কিছুই বুঝে আসছে না, সে কি করবে। কোন দিকে যাবে। তার প্রতিটি পরিকল্পনা বাস্তবে আলোর মুখ দেখার আগেই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদরা পাগমান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানীর উপর প্রায় প্রতি রাতেই আক্রমণ করছেন। এখন তারা কাবুল এয়ারপোর্টের উপরও হামলা শুরু করে দিয়েছেন এবং উত্তরোত্তর তাদের আক্রমণ আরো জোরদার হচ্ছে। শোলোখোভের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের ভিতর অবশ্যই মুজাহিদদের কোন চর রয়েছে; কিন্তু প্রশ্ন হল সেই চরটি কে?

এটা জানার জন্য সে পালাক্রমে সবাইকে চেক করেছিল।

তবে আজ পালা মেজর উরখানের।

কর্ণেল শোলোখোভ জেনে-বুঝে ইচ্ছা করে উরখানের উপস্থিতিতে একটা অপারেশনের পরিকল্পনা করল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ্যামুনেশনে বোঝাই একটা ট্রাক রাতের অন্ধকারে কাবুলের একটা পাহাড়ী স্থানে পৌঁছবে।

।। ২ ।।

কর্ণেল যা ভেবেছিল, তা-ই হল। সেই নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাকটি যখন মোড় নিতে যাচ্ছে, মুজাহিদরা ঠিক তখনই প্রতিবন্ধকতা খাঁড়া করে

ট্রাকটি থামিয়ে দিলেন। ট্রাকে দুজন আফগান সৈনিক ও গোলাবারুদের খালি খোলস ছাড়া আর কিছুই নেই। মুজাহিদরা চেক করে তাদের কাঙ্খিত এ্যামুনেশন পেলেন না, যার খবর তারা পেয়েছিলেন মেজর উরখানের মাধ্যমে।

শোলোখোভ তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই চালাকিটা করেছে। তাতে সে সফল হল। সে এটাও জেনে ফেলল যে, তথ্যটা মুজাহিদদেরকে দিয়েছে মেজর উরখান। কিন্তু কোন মতেই সে এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে উরখানকে রাশিয়া ও কমিউনিজমের একজন বিশ্বস্ত সমর্থনকারী ও বন্ধু মনে করত।

সেদিন উরখান তার নিয়ম অনুযায়ী কাবুলের একটা পুরনো কাহ্ওয়ার (চা জাতীয় এক ধরনের পানীয়) দোকানে গেল। সে ভাবতে পারেনি, তার পেছনে সরকারী চর লাগা রয়েছে এবং তার নজরদারী চলছে।

তার নজরদারী করার জন্য কর্ণেল শোলোখোভ বিশেষভাবে এমন লোকদের নির্বাচন করেছে, যাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত এবং তারা মনেপ্রাণে নাস্তিক ও বেদ্বীন। তাদের সম্পর্ক ছিল সরাসরি কেজিবির সঙ্গে। তারা কাবুলে কেজিবির জন্যই গোয়েন্দাগিরি করে। রুশ ইন্টেলিজেন্স নিজেদের গোয়েন্দা জাল রড় শক্তভাবে বিছিয়ে রেখেছে। আফগান গোয়েন্দা খাদ যদিও তাদেরই হাতেগড়া ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তা সত্ত্বেও রুশ কর্মকর্তারা তাদের গোয়েন্দা বিভাগ কেজিবি-র একটা স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক পুরো আফগানিস্তানে বিছিয়ে রেখেছে। কেজিবি-র যেসব এজেন্ট রয়েছে, তাদেরকে খাদ-এর এজেন্ট থেকে আড়াঁলে রাখা হয়। খাদ-এর চররা জানে না যে, কারা কেজিবির এজেন্ট।

রুশরা এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে. যে, হয়ত কোন সময় আফগানীদের ধর্মীয় চেতনা জেগে ওঠতে পারে এবং আজ মুষ্টিমেয় যেসব লোক বাহ্যিকভাবে তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে ও সহায়তা করছে, হয়ত তারাও যেকোন মুহূর্তে তাদের জন্য অচেনা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন হয়ত এদেশীয় কেজিবি এজেন্টই তাদের

কাজে আসতে পারে এবং তাদের সহায়তায় আফগানিস্তানে ষড়যন্ত্রের নতুন কোন স্কীম প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

এমনিতেও এসব এজেন্ট দিয়ে তারা "অফ দি রেকর্ড" কাজ করায়। তাদেরই মাধ্যমে কাবুলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপর নজরদারী করে এবং তাদের খেয়াল, মতামত ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে।

আজ মেজর উরখানের যারা নজরদারী করছে, তারাও হল সেই কেজিবির কেনা গোলাম।

সেই বিশেষ কাহ্ওয়ার দোকানে পৌঁছে মেজর উরখান একটা চেয়ারে বসলেন। দোকানটা সিগারেটের ধূয়ায় ভরা। দোকানটা বেশ বড় ও কাষ্টমার দিয়ে সব সময় সরগরম থাকে।

মুজাহিদরা উরখানের সঙ্গে দেখা করার জন্য এ ধরনের স্থান নির্বাচন করতে পছন্দ করেন। আজও যেমনি তিনি দোকানটিতে ঢুকলেন, তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আগে থেকেই হাজির একজন স্থানীয় আফগানের দৃষ্টি মেজরের উপর স্থির হয়ে রইল। সে কাহ্ওয়া পান করছিল। সে তাড়াতাড়ি কাহ্ওয়ার পেয়ালা শেষ করল এবং উরখানের বসার অপেক্ষায় রইল। উরখান যখন চেয়ারে বসলেন, তার দু-তিন মিনিট পরই সে তার কাছে গিয়ে হাজির হল। উরখান ওঠে তার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন–মনে হচ্ছে তারা দুজন পুরনো বন্ধু। এ ব্যাপারটা দুজনের কেউ টের পেল না যে, আফগান কেজিবির দু'জন এজেন্ট মেজর উরখানের পিছু নিয়েছে এবং এখন তারা তাদের উপরেই সতর্ক দৃষ্টিতে নজরদারী করে যাচ্ছে। মেজর যখন কথা সেরে সেই নবাগতসহ বের হলেন, তখন একজন একজন করে কেজিবি'র এজেন্ট তাদের পিছনে লেগে গেল।

এরপর থেকে কর্ণেল শোলোখোভ নিজের বিশেষ ও বিশ্বস্ত চরদেরকে উরখানের পিছনে লাগিয়ে রাখল। আরেকদিন আরেকটা চায়ের দোকানে মেজর উরখান ও মুজাহিদ এজেন্টের গোপন বৈঠকের ব্যাপারটা কেজিবির সদস্যরা মনিটার করে কর্ণেল শোলোখোভের কাছে রিপোর্ট করল। রিপোর্ট শুনে কর্ণেল

শোলোখোভের যেন রক্ত মাথায় চড়ে গেল। তার চক্ষু রক্তখেকো ড্রাকুলার মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে তখনি একটা বিশেষ কমান্ডো বাহিনীকে তাকে গ্রেফতার করে আনার নির্দেশ দিল।

।। ৩ ।।

মেজর উরখান কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু নয় যে, তিনি ব্যাপারটার নাজুকতা অনুধাবন করতে পারছেন না। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। উরখান একজন জুনিয়র অফিসারকে চারজন সৈন্য সঙ্গে করে তারই ব্লকের দিকে আসতে দেখলেন। তখনি তিনি বুঝতে পারলেন, হাবভাব ভাল নয়। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় তাকে সম্ভাব্য বিপদের অসনি সংকেত দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত তার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় কখনো ভুল সংকেত দেয়নি। এক মুহূর্তের জন্য তিনি কি যেন ভাবলেন। তারপর ঘরের টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করলেন; কিন্তু লাইন পেলেন না। কি ভাবে পাবেন! সকাল থেকেই তার বাড়ীর লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। তিনি যেই মাত্র রিসিভারটা নিচে রাখলেন, ইন্টারকমের ঘন্টা বেজে ওঠল। নিজের ভিতরের অবস্থাকে স্বাভাবিক করে তিনি স্পন্দিত মনে ইন্টারকম ওঠালেন। অন্যদিক থেকে ব্লকে মোতায়েনকৃত গার্ড-ইনচার্য তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

“স্যার! আপনাকে অপারেশনাল চীফ স্মরণ করেছেন।”

“আচ্ছা, আমি এখখুনি আসছি।” সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে মেজর ফোন রেখে দিলেন। তার কাছে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় হাতে আছে। এক লহ্‌মার জন্য মেজর উরখান কিছু ভাবলেন। দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কাপুরুষের মত দাসত্বের জীবন ধারণের চেয়ে বীর পুরুষের মত একবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ঢের ভালো।

রুমের এক কোণে রাখা তার ক্লাশিনকোভটি উঠিয়ে নিলেন। সে মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার ধ্যাণ তার কলিজার টুকরা ইয়াসমীনের প্রতি চলে গেল; কিন্তু কেমন জানি একটা অদৃশ্য শক্তি

তাকে বুঝিয়ে দিল, "তোমার শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ইয়াসমীনের জন্য আল্লাহ আছেন এবং ওর স্বামী ফয়জান রয়েছে।"

রুম থেকে বের হওয়ার সময় তিনি খাঁটি মনে নিজের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। ব্লকের দরজার দিকে পা বাড়ানোর মুহূর্তে তার মনে হল যেন, তিনি হালকা হয়ে বাতাসে উড়ছেন।

তার মনের সব বোঝা সরে গেছে।

।। ৪ ।।

তার হাতে রয়েছে ক্লাশিনকোভ। ব্লকের দরজায় মোতায়েন গার্ডদের জন্য এটা কোন আচম্বিত ব্যাপার নয়। কারণ যে বিশেষ এন্টি মুজাহিদীন গ্রুপের সাথে মেজর উরখানের সম্পর্ক, তার সদস্যরা সবসময় ষ্ট্যান্ড টু পজিশনে থাকে। বিশেষ করে নিজের উপরস্থকর্মকর্তাদের কাছে যাওয়ার সময় তারা সশস্ত্র অবস্থায় যায়। তবে দরজার কাছে পৌঁছলে তাদেরকে অস্ত্র সেখানে রেখে যেতে হয়।

জুনিয়র অফিসার এবং তার কমান্ডো সাথীরা উরখানের সম্মানার্থে তাকে স্যালুট করল। তাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া আছে যেন মেজর উরখানকে কর্ণেল শোলোখোভের দরজা পর্যন্ত মোটেও কিছু না বলা হয়। এ সতর্কতাটা এজন্য নেয়া হয় যেন স্থানীয় কর্মচারীরা মেজর উরখানের সমর্থন করে এখানেই তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের সশস্ত্র বিদ্রোহ করে না বসে। কারণ, সাধারণ কর্মচারীরা মেজর উরখানকে সত্যিই ভালবাসে।

শোলোখোভের রুমের দরজা পর্যন্ত কমান্ডোরা তার আগে আগে চলল। দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে থেমে তারা তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু এ কি? জমিন যেন তাদের পাগুলো শক্তভাবে আকড়ে ধরে রেখেছে। তারা একদম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কারণ, মেজর উরখান তার ষ্টেনগানটি তাদের দিকে তাক করে রেখেছেন। দরজায় মোতায়েন রাশান গার্ডটি এখনো সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি।

"নিজেদের অস্ত্রগুলো নীচে রেখে এখ্খনি তোমরা এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি চাই না, কোন মুসলমানের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করি। তোমরা নামে হলেও মুসলমান।"

মেজর উরখানের কণ্ঠে দৃঢ়তা এবং দৃষ্টিতে সত্য ও ন্যায়ের প্রত্যয় দেখে সত্যিই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেল, ইনি সত্যই বলছেন। শুধু হুমকি দিচ্ছেন না; যা বলছেন, করে ছাড়বেন।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে সেখানে পাঁচটি ক্লাশিনকোভ পড়ে রইল এবং উরখানের নির্দেশ অনুযায়ী তারা উল্টো পায়ে পালাল। ঠিক সে মুহূর্তে কামরার দরজা খুলে গেল এবং ডিউটিরত রাশান সেনাটি ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। আজ এখানে পাহারার দায়িত্ব সেই পালন করছিল। মনে হয় কোন কাজে ভিতরে গিয়েছিল।

।। ৫ ।।

বাইরের পরিস্থিতি তার কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেজর উরখানের স্টেনগান অগ্নি উদগীরণ করতে শুরু করল। পরপর দশটি গুলি রাশান গার্ড-এর বুক ঝাঝড়া করে ফেলল। ফোয়ারার মত রক্ত ছুটল। সে ঢলে পড়ে গেল। ভিতরে কর্ণেল মিখাইল শোলোখোভ বাইরের অবস্থা উপলব্ধি করার আগেই কামরার দরজাটা মেজর উরখানের শক্তিশালী লাথিতে খুলে গেল।

শোলোখোভ তার হোলিস্টার থেকে রিভলবার বের করতে খুবই ফুর্তি দেখাল; কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বেশী তড়িৎ দেখাতে পারল না। উরখানের ক্লাশিনকোভ ছয়টা জ্বলন্ত অঙ্গার তার চেহারা ও চোখটাকে ঝাঝড়া করে দিল।

উরখান খুব তড়িৎ গতিতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে এসে তিনি যে শেষ দৃশ্যটি দেখলেন তা হচ্ছে, তিনজন রুশ সৈনিক ক্লাশিনকোভ উঁচু করে দ্রুত বেগে তারই দিকে দৌড়ে আসছে।

রাশান সৈনিকদের আর উরখানের ট্রিগারের উপর আঙ্গুলের চাপ একই সাথে পড়ল। মেজর উরখানের আর তাদের শেষ পরিণতি দেখা নসীব হয়নি। তবে তিনি গুলি খেয়ে পড়ার সময় শেষ দৃশ্য এটাই দেখলেন যে, রাশানরা ঢলে পড়ছে।

ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে কাছের ব্যারাক থেকে আফগান সিপাহীরা দৌড়ে এলো। তারা উরখানের উপুড় হওয়া শরীরকে সোজা করল। উরখান ধীরে ধীরে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর তার চোখ দুটো দূরে কোথাও শূন্যে স্থির হয়ে গেল। ওষ্ঠদ্বয়ে লেগে আছে এক টুকরো স্থায়ী ঈষৎ হাসি।

তার বিড়বিড় শব্দও বন্ধ হয়ে গেল।

"ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন।" বুড়ো আফগান সেনাটি এই দোয়া পড়ে তার চতুর্পার্শ্বে জড়ো হওয়া জোয়ানদের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন এবং উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে নিজের কম্পিত হাতের আঙ্গুল দিয়ে মেজর উরখানের খোলা চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন।

কাছেই পড়ে থাকা তিনজন রাশান মৃত্যু যন্ত্রনায় মাটিতে পা ঘসছে। কিন্তু কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভব করল না। তাদের চোখে রক্ত এসে গিয়েছে। মনের মধ্যে রাশানদের জন্য চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ। কিন্তু তারা কিছু করতে সাহস পেল না। তারা কিংকর্তব্যবিমুঢ়। এখানে যা কিছু ঘটেছে, তার সবই তারা বুঝে ফেলেছে। তারা একজন আরেকজনের সাথে মত বিনিময় করতে ইতস্ত বোধ করছে। কারণ, হতে পারে তার সঙ্গী রাশানচর। কাজেই তারা খামোশ।

খাদ ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার খানকে তার দুজন সশস্ত্র গার্ড সহ আসতে দেখে তারা ভারি পায়ে নিজ ব্যারাকে চলে গেল। ইসফানদিয়ার খান জমিনে বসে কিছুটা নুইয়ে মেজর উরখান শহীদের পবিত্র শরীরের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

"ও আমার খোদা!" তার অন্তর থেকে একটা আহ্ শব্দ বের হল। এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন। খোলা দরজার

উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এরপর স্বীয় সঙ্গীদের নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন। কর্ণেল শোলোখোভের বিকৃত লাশটির উপর দৃষ্টি পড়তেই এমন একটি দীর্ঘশ্বাস তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, মনে হল যেন একটি ভারী বোঝা থেকে তিনি নিস্কৃতি পেয়েছেন। তিনি শোলোখোভের লাশটির একেবারে কাছে এসে বসে যাচাই করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, তার মৃত্যু কি নিশ্চিত হয়েছে! যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি কোন স্বপ্ন দেখছেন না; বরং সব জ্বলন্ত সত্য। তখন তিনি ভারি পায়ে সেখান হতে বাইরে চলে এলেন। তাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল। মেজর উরখানের শাহাদাতে তিনি অনেক মর্মাহত ও ব্যথিত ছিলেন। তবে তিনি এজন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যে, মেজর উরখান অসম্মানজনক উপায়ে মরেননি। তিনি ইজ্জতের সাথে মারা গেছেন এবং একজন বর্বর, লম্পট ও হায়েনা প্রকৃতির লোককে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে তবে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। এটা ভিন্ন কথা যে, কর্ণেলের স্থানে কে আসবে? হয়ত তাঁর চেয়েও বেশী বর্বর ও জালেম আসতে পারে! আর এ পদটিতে রাশানরাই থাকবে। যা কিছু হোক, আপাতত কিছু সময়ের জন্য হলেও ডাইরেক্টর ইসফানদিয়ার প্রশান্তি বোধ করছিলেন।

নতুন পথের যাত্রী

রাতের সেই প্রহরে ইয়াসমীনের বেডরুমের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে তারা দুজনই পেরেশান হয়ে পড়ল। তারা আলাপ করছিল। হঠাৎ করে কে যেন দরজার কড়ায় আলতোভাবে নাড়া দিল। তারা চমকে গেল। "কে হতে পারে?" ফয়জান ভাবল।

তার এখানে উপস্থিতির ব্যাপারটা কাছেরই মুজাহিদীন মারকাজকে সে বলে এসেছিল। মুজাহিদীন কেন্দ্র থেকে তাকে তলব করা হয়নি তো আবার? নাকি শত্রুরা এখানে তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলেছে?

যে কোন কিছুই হতে পারে! তাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইয়াসমীনের মুখখানা বিষন্নতায় ছেয়ে গেল। ভয়ে পান্ডুর হয়ে গেছে। সে ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো দরজা খোলার জন্য। ফয়জান আঙ্গুলের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে দরজার সাথের দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। এবার সে ইয়াসমীনকে দরজা খোলার জন্য ইংগিত দিল। ফয়জান নিজের ক্লাশিনকোভটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত পজিশনে ধরে রাখল। সে এমনভাবে দাঁড়াল যে, ভিতরে আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব নয়। ইয়াসমীন ফয়জানের অভিপ্রায় বুঝে গেল; কিন্তু তার শরীর যেন অবশ হয়ে পড়েছে। সে সামনে এগুতে পারছে না।

ইয়াসমীন নিজের সাহস সঞ্চার করল। ত্রস্তপদে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো এরই মধ্যে আরো দুবার কড়ায় নাড়া পড়ল। সে কম্পিত হাতে দরজা খুলে দিল।

।। ২ ।।

আগন্তুক নিজের মুখখানা বড় রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

"ভয় পেয়ো না মা! আমি তোমাদের আপনজন।" লোকটি ভিতরে ঢুকামাত্রই খুব দ্রুত কথাগুলো বলে ফেললেন, যেন ইয়াসমীন স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ফয়জান মুখোশ পরা সত্বেও লোকটিকে চিনে ফেলল, লোকটি আর কেউ নয়, কাসেম ঈশানজাদা। তিনি এ অসময়ে কেন এলেন? খবর ভাল তো? ফয়জান দরজার কাছ থেকে বের হয়ে একেবারে সামনে এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম চাচা! খবর ভাল তো!"

"আল্লাহ আমাদের সবার উপর করুণা বর্ষন করুন!"

ঈশানজাদা একটা গভীর শ্বাস গ্রহণ করে মুখে পেচানো কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন। তিনি ইয়াসমীনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"মা! মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে সৌভাগ্যবান হচ্ছেন তারা, যারা ঈমান নিয়ে উত্তমভাবে মৃত্যু বরণ করেন। আমি তোমার জন্য কোন সুসংবাদ নিয়ে আসিনি। তবে তুমি একজন মুসলিম আফগান মেয়ে হিসেবে তোমার জন্য আমার খবরটা মন্দও না। আমরা খবর পেয়েছি, তোমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মেজর উরখান খাদ-এর অপারেশনাল চীফ কর্ণেল মিখাইল শোলোখোভকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে নিজেও শাহাদাত বরণ করেছেন। বেটী! তোমার আব্বু উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন একজন মুজাহিদ ছিলেন। তিনি জান বাজি রেখে ইসলাম ও জিহাদের জন্য কাজ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন।"

এতটুকু বলে তিনি খানিকের জন্য থামলেন। ইয়াসমীনের মনে হল, যেন আচানক কেউ একটি শক্তিশালী ঘুঁষি তার বুকের উপর

মেরে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ও। সে ফুঁপিয়ে ফঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালঙ্গের এক কোণে বসে পড়ল। ফয়জান যদিও পুরুষ, তারও পক্ষে নিজের আবেগকে সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। সে শত চেষ্টা সত্বেও তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!" সে বিড়বিড় করে পড়ল।

কাসেম ঈশানজাদা সামনে এগিয়ে ক্রন্দনরত ইয়াসমীনের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মা! আমি অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে আরেকজন সঙ্গীকে সাথে করে এখান পর্যন্ত এসেছি। আমাদের হাতে সময় খুবই কম। যে কোন মুহূর্তে শত্রুরা এখানে এসে যেতে পারে। তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও। আমাদেরকে এখ্খনি এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।"

শোকার্ত ইয়াসমীন পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে ভুল করল না। সে তড়িৎগতিতে নিজের অবস্থা স্বাভাবিক করে নিল। সে চমৎকার মনোবল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ওঠে দাঁড়াল এবং নিজের শালের আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো।

"আমরা দরজার কাছে তোমাদের অপেক্ষা করছি। যত শিগগীর সম্ভব তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। বেশী আসবাবপত্র নেওয়ার দরকার নেই। শুধু একটা এ্যাটাচী কেসে যতটুকু মাল-সামান ধরে ভরে নাও। জলদি করো।"

এ বলে কাসেম ঈশানজাদা বাইরে চলে গেলেন। ফয়জান ইয়াসমীনের ব্যথা বুঝতে পারছে; কিন্তু সে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু এতটুকুই বলতে পারল ঃ

"ইয়াসমীন! জান আমার! তোমার ব্যথা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। তুমি নিজেকে কখনো অসহায় ভেবো না। তুমি আমাকে সব সময় একজন আদর্শ স্বামী ও আদর্শ সঙ্গী হিসেবে পাবে। তুমি দুঃখিত হয়ো না। তোমার আব্বু আল্লাহর পথের একজন মহান শহীদ। আমাদের হাতে সময় কম। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।" এ বলে ফয়জানও রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। ইয়াসমীন তাড়াহুড়ো করে ব্যথিত মনে নিজের মায়ের অলংকার ও তার কয়েক

জোড়া কাপড় এ্যাটাচী কেসে তুলে নিল। কামরার এক কোণে রাখা তার বাবা-মার ছবি। ছবি দু'টোর দিকে সে এক মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ফয়জান ভিতরে আসলে ইয়াসমীন তাকে জিজ্ঞেস করল, "ছবিগুলো কি নেওয়া যায়?"

"না, আমার জান! তোমার মা-বাবা সব সময় আমাদের হৃদয়ের পর্দায় উদ্ভাসিত থাকবেন। ইসলামে কোন প্রাণীর ছবি ঘরে রাখা ঠিক নয়। তাই এগুলো নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

ইয়াসমীন স্বামীর কথা মেনে নিয়ে সেগুলো আর এ্যাটাচী কেসে ভরল না।

ফয়জান এ্যাটাচী কেস হাতে তুলে নিল। তারপর দু'জনই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"আমরা প্রস্তুত।"

অন্ধকারে নিজের দিকে অগ্রসরমান একটি ছায়াকে দেখে ফয়জান ক্ষীণ কণ্ঠে বলল।

"এদিকে আমার সাথে এসো।" ঈশানজাদার সঙ্গী বলল। তারা সামনে অগ্রসর হল। কিছু দূরেই সতর্ক অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলেন কাসেম ঈশানজাদা। তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি এখখুনি আসছি।" সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর হাতে রয়েছে চামড়ার একটা থলে। তিনি তাদের কাছ দিয়ে সামনে বাসার দিকে অগ্রসর হলেন। ফয়জান বুঝতে পারল, তিনি ওখানে কি করতে যাচ্ছেন। ঐ থলেটাতে অবশ্যই কোন শক্তিশালী টাইম বোমা রয়েছে। ঈশানজাদা দু-তিন মিনিটের ভিতর নিজের কাজ সমাধা করে ফিরে এলেন।

।। ৩ ।।

কাবুলের সেই আধুনিক আবাসিক এলাকা থেকে চারটি ছায়া একজন আরেকজনের পেছনে হেঁটে চলল। রাতের গভীর আঁধার দ্রুত তাদেরকে ঢেকে নিল। রাতের মধ্যেই তারা পনের বিশ মাইল

রাস্তা পায়ে হেঁটে পেরিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে কয়েক বার কারফিউর সময় টহলরত রুশ ও আফগান সৈনিকদের জীপের আলো থেকে নিজেদেরকে লুকোতে হয়। কাবুল নগরীতে বেশীর ভাগ নৈশকালীন টহল রুশ সেনারা দিয়ে থাকে। সকাল বেলায় তারা নিজ ছাউনীতে ফিরে যায়।

ইয়াসমীনের পক্ষে এ ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু অবস্থার নাজুকতা সম্পর্কে উপলব্ধি তার চেয়ে আর কার বেশী হতে পারে। সে জানে যদি একবার খোদা-নাখাস্তা এসব মানব হায়েনা তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তাহলে তার মানহানী সহ তার শরীরটা রুশ হায়েনারা টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

দ্বিগন্তে সুবহে সাদিকের আলো ছড়িয়ে পরার আগেই তারা নিজেদের একটি নিরাপদ ঠিকানায় পৌঁছতে সক্ষম হল। ফজরের নামাযের পর ইয়াসমীনের শহীদ পিতার রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়। পুরো দিন তারা ওখানে বিশ্রাম নেয়। সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তারা স্বামী স্ত্রী অন্য দুজন মুজাহিদদের সঙ্গে পরবর্তী ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এবার তাদের গন্তব্যস্থল ছিল পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত একটি মুহাজির ক্যাম্প। সেখানেই ফয়জান ইয়াসমীনকে পৌঁছিয়ে দিতে যাচ্ছে। ফয়জানকে জোর করে দু'সপ্তাহের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এরপর তাকে আবার রণাঙ্গনে ফিরে যেতে হবে।

।। ৪ ।।

অন্য দিকে তাদের রওনা দেওয়ার পনের বিশ মিনিট পরই তিনটি ফৌজী ট্রাক কাবুলের আধুনিক আবাসিক এলাকার সেই বাংলোটি ঘেরাও করে ফেলল। তারা নিজেদেরকে অনেক চৌকস সেনা ভাবছিল। যেভাবে তারা বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে এতে করে আসামীর অর্থাৎ ইয়াসমীনের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভবপর না; কিন্তু সেখানে তাদের কাঙ্খিত আসামী নেই; তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক মৃত্যু ও ধ্বংস। এই মরণ আধা ঘন্টা

ধরে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। টাইম বোমাটা ঠিক সেই সময় প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল, যখন বর্বর সৈনিকরা ঘরটিতে তল্লাশী চালাতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সেই ঘরটা সহ যত সৈনিক সেখানে এসেছে বিস্ফোরণের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল এবং সব কিছু ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল! বিস্ফোরণ এত মারাত্মক হল যে, বহুদূর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বিল্ডিংয়ের জানালার কাচ ভেঙ্গে গেল!

।। ৫ ।।

চার বছর পরের ঘটনা। তারিখ ৮ই মার্চ, ১৯৮৭ সন। পাকিস্তানের এক সীমান্ত এলাকায় বানানো মোহাজিরীন ক্যাম্পে তাঁবুর যে লম্বা সারি রয়েছে, তারই শেষ মাথায় খাঁটানো তাঁবুটার বাইরে একজন বৃদ্ধ মহিলা তার পুত্রবধুর সঙ্গে বসে আছেন। আড়াই বছরের একটা ফুটফুটে বাচ্চা একবার তার দাদীর কোলে চড়ছে, আবার দৌড় দিয়ে মায়ের কোলে এসে বসছে।

"মাকে কিছু করতে দেবে নাকি?"

বৃদ্ধা দাদী স্নেহভরে বাচ্চাকে চুমু দিয়ে বললেন।

বাচ্চাটা এক লহ্‌মার জন্য গোশ্বাভরে দাদীর দিকে তাকাল এবং অভিমান করে এক কোণে চলে গেল।

"একেবারে ফয়জানের মত হয়েছে। ও ও এমন ছিল।"

তিনি পুত্রবধু ইয়াসমীনকে লক্ষ্য করে বললেন। ইয়াসমীন শাশুড়ির কথাশুনে ছেলের অভিমান দেখে মৃদু হাসল। সে শাশুড়ীর সাথে বসে একটা পশমী শাল তৈয়ার করছে। সাথে সাথে ভাবছে, আরে! আজই তো তার প্রিয় মুজাহিদ স্বামীর ফিরে আসার দিন। আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী একটা মুজাহিদ বাহিনী রণাঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করবে। আরেকটা বাহিনী ফিরে আসবে বিশ্রামের জন্য। যারা জিহাদে যাবে, তারা নিজেদের রাইফেলগুলো খুলে রোদ্রে বিছিয়ে রাখছেন এবং সেগুলো মন দিয়ে পরিষ্কার করছেন।

হঠাৎ পুরো ক্যাম্পটাতে হৈ চৈ পড়ে গেল। দশ দিন আগে মুজাহিদদের যে দলটা রণাঙ্গনে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে। বৃদ্ধা মহিলা আর তার যুবতী পুত্রবধুর দৃষ্টি আগত কাফেলার ভেতর একজনকে খুঁজল। এই কাফেলার মধ্যে সেই কাঙ্খিত মানুষটাকে তারা পাচ্ছে না, অথচ এদের সাথেই তার আসার কথা। ক্যাম্পের মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চারা আগন্তুকদের ঘিরে ধরেছে। এ কাফেলার মধ্যে তিনজন মুজাহিদ কম ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই এমন হয়। রণাঙ্গন থেকে পুরোদল খুব কমই ফিরে আসে।

লোকদের ভীড় চিরে কাসেম ঈশানজাদা কোনমতে বেরিয়ে এলেন। তার ভারি পা দুখানা সেই শেষ তাঁবুটির দিকে যাচ্ছে। ঈশানজাদাকে সে দিকে আসতে দেখে না জানি কেন ইয়াসমীনের হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। ইয়াসমীন দাঁড়িয়ে তাকে সালাম করল। ঈশানজাদা ছালামের উত্তর দিয়ে তার কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তার গলাটা বন্ধ হয়ে আসল। শেষ পর্যন্ত অনেক সাহস করে কথাগুলো বললেন ঃ

"বেটী! কুদরতের কি লীলা খেলা। আজ আবার আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একদিন আমি তোমার মহান পিতার শাহাদাতের খবর এনেছিলাম। আজ নতুন আরেকটি দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

ক্ষণিকের জন্য থেমে তিনি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন।

"আমার স্নেহের ইয়াসমীন! আল্লাহ তোমাকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমার বেটী! তোমার বীর স্বামী, আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী আমাদেরকে ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। আল্লাহ তার মর্তবাকে বুলন্দ করুন।" আমীন।"

বৃদ্ধা মহিলা এ সংবাদ শুনে নির্বাক হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্রন্দনরত বধুকে দুর্বল শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ইয়াসমীনরে কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে। বৃদ্ধ কাসেম ঈশানজাদার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল। তার সাদা দাড়ি বেয়ে দরদর করে অশ্রু

গড়িয়ে পড়ছে। এক মুহূর্তের জন্য তিনজনের দৃষ্টি পড়লো মাহ্‌মূদ উগ্‌লুর উপর। ও সবকিছু থেকে বেখবর হয়ে একজন মুজাহিদের রাইফেল পরিষ্কার করার কাজ দেখছে। এ মুজাহিদটি আজ রাতে সেই কাফেলার সঙ্গে যাবেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে ও পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে শহীদ ফয়জান উগ্‌লু (রঃ) এর ছেলে মাহমুদ উগ্‌লুকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন রাইফেল কি ভাবে ফায়ার করতে হয়।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে নতুন একটা মুজাহিদ কাফেলা রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। মোহাজির ক্যাম্পের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাফেলাকে বিদায় জানালেন। ইসলামের এ সকল মহান গাজীদের জন্য সবাই দোয়া করলেন।

একটা তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে শহীদ ফয়জান উগ্‌লুর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ইয়াসমীন মাহ্‌মূদ উগ্‌লুকে কোলে নিয়ে এ কাফেলাকে দেখছেন। ইয়াসমীন ভাবছে, হয়ত কোন একদিন তার মাহ্‌মূদও এসব ইসলামের গাজীদের কাফেলায় শরীক হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরব পুণরুদ্ধারের জন্য জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

"হে আল্লাহ! আমার মাহ্‌মূদকে ইসলামের একজন মহান বীর মুজাহিদ হওয়ার তৌফিক দান করুন।"

ইয়াসমীনের চোখ বেয়ে দরদর করে পানি গড়িয়ে পড়ছে। বৃদ্ধার চোখেও অশ্রু। জিহাদী কাফেলা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে বৃদ্ধা তার শহীদী ছেলের স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে তাবুর ভিতর চলে এলেন।

(সমাপ্ত)

জীবন্ত পাহাড়ের সন্তান (২)

মূল ঃ তারেক ইসমাঈল

ভাষান্তর ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

প্রকাশক

শেখ আবু খালেদ

আল-খালেদ প্রকাশন

ফোন ঃ ৯৮৭২৫৫৩

পরিবেশনায়

১। দারুল মাআরিফ

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

২। তাসনিয়া বই বিতান

১৯১, ওয়ারলেস, রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা

৩। প্রফেসর বুক সেন্টার

১৯১, ওয়ারলেস, রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা

৪। আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার/কাঁটাবন, ঢাকা

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০০৩

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

আল-খালেদ প্রকাশন